'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' গ্রন্থমালা : ৮

কাক ও সংস্কৃতি

শ্রীসনৎকুমার মিত্র
সম্পাদিত

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৭০০ ০০৯

কাক ও সংস্কৃতি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কাক

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর ১৯৯৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত

প্রকাশক :
যুগ্ম-সম্পাদক
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
৬০ জেমস লঙ সরণি, বেহালা
কলিকাতা—৭০০ ০৩৪

মুদ্রাকর :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

কাক ও সংস্কৃতি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কাক

শ্রীমতী সিপ্রা চক্রবর্তী
ড. শ্রীশ্যামলকান্তি চক্রবর্তী
অশেষ প্রীতিভাজনেষু



কালীঘাটের চৌকো পট

শৃগালের বদলে কাকের ব্যবহার

নাপিত কাক॥ পোড়ামাটির প্যানেল

: মুখবন্ধ :

'লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা' বাঙলা লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা আনতে পেরেছে বলে আমরা মনে করি। এতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। একটি বিষয় নিয়ে একটি বই। কোন কোন সময়ে এমনও হবে যে একটি বড় বিষয়কে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনামে একাধিক বই তৈরি হতে পারে। ফোকলোর তত্ত্বের দিক, বিভিন্ন উপাদান, ফোক পারফরর্মিং আর্টের বিচিত্র প্রজাতি, লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ, শীলিত সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে ফোকলোরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সমস্যা অবলম্বন করে আমাদের এই গ্রন্থমালা। বইগুলি সংক্ষিপ্ত, তবে প্রসঙ্গটিকে পূর্ণ ও সংহতভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদিকে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি সেই পরিচয় সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বিষয়টির পরিচয় দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করা এবং তার জন্য আমরা সর্বদা এমন লেখকের সন্ধানে থাকব যাঁর বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে। এই তিনটি সূত্রে আমাদের পুস্তকগুলিকে মৌলিক রচনা করে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য যে-সব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি, সে-সব ক্ষেত্রে পথিকৃত হওয়া। যে-সব বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে সেখানে আমরা আধুনিক ভাবনা আনবার চেষ্টা করছি। যে-সব বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে আগে বিবেচিত হয়নি, তাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হওয়ার উদ্দেশ্যই আমাদের।

তাই আমরা কখনও একজন লেখকের বই প্রকাশ করব। কখনও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একাধিক লেখকের প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করব। আমরা দামি পুরনো লেখা সংকলনে সর্বদা আগ্রহী, সুযোগ পেলে এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণও করব।

আমাদের পরিষদ অনেকদিন ধরে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় নিবিষ্ট এবং বারো বছর ধরে আমরা একটি গবেষণা ত্রৈমাসিক বের করছি নিয়মিত, একটি সংখ্যা একবারও না থেমে।



যমের সিংহাসনের নিচে কাক॥ ১নং চিত্র



বেহুলার মাঞ্জাসের মাথায় শ্বেত কাক।

লোকসংস্কৃতির প্রতি যাঁদের প্রীতি, তাঁরা যদি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, যাঁরা লোকসংস্কৃতি-বিষয়েব ছাত্র তাঁরা যদি এই গ্রন্থমালা দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হন, তাহলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং পত্রিকার সম্পাদক ড. সনৎকুমার মিত্র সাধারণভাবে এই গ্রন্থমালা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন; বিশেষক্ষেত্রে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকি। কখনও কোন বিশেষ প্রকল্পে অতিথি সম্পাদকও আমন্ত্রিত হতে পারেন।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

সভাপতি

অক্টোবর ১৯৯৯ — লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ



চৌকো পট॥ ৪নং চিত্র



জড়ানো পট॥ যমদূত শাস্তি দিচ্ছে
কাক ওপরে বসে দেখছে

◻ সম্পাদকের নিবেদন ◻

◻ প্রায় সবাই জানেন 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ' [প্রতিষ্ঠা ১৯৬১] মৃতপ্রায় পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তাকে ভারতীয় লোকনৃত্য-মানচিত্রের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার পাশে পাশে লোকসংস্কৃতির চর্চা, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নানা কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' নামে একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশ করে চলেছে। এর প্রতিটি সংখ্যাই লোকসংস্কৃতির এক একটি দিক নিয়ে 'বিশেষ সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে — যা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় অভিনব এবং একমাত্র প্রচেষ্টা হিসাবে স্বীকৃত।

◻ এইভাবে বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ চলতে থাকার সময় ১৩৯৮, কার্তিক-পৌষ [৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা] সংখ্যাটি 'কাকমারা' /'কাক ও সংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। কর্কশরবকারী, সর্বভুক, কুদর্শন, ঝাড়ুদার ও নিঘিন্নো এই পাখিটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে , আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তা এর আগে আর কেউ এমনভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। একটি আঞ্চলিক ভাষায় এমন অভিনব চেষ্টার জন্যই বোধহয় বহুলপ্রচারিত একটি বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখেছিলেন [১২.১২.১৯৯৪] : "মনে পড়ে এই সাময়িক পত্রটি 'কাক ও সংস্কৃতি' নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করে চমকে দিয়েছিলেন।"

◻ বিদগ্ধজনের এই অভিরতি আমাদের যে গৌরবদান করেছিলো তা মনে রেখেই পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিলো যাতে ঐ কাককে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপ্রকাশ করা যায়। আজ সেই চেষ্টা ফলবতী হওয়ায় আমরা তৃপ্ত।

◻ প্রসঙ্গত বলি, পত্রিকায় প্রকাশের সময় কাক নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল, মাত্র ছয়। এখানে তা ডবলেরও বেশি; যা দিয়ে 'কাক'কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব হয়েছে। পত্রিকায় ছিলো এমন একটি লেখা বাদ গেছে, অন্যগুলিকে প্রবন্ধকারেরাই নতুন করে মার্জনা করে দিয়েছেন। কাকের কয়েকটি ছবিও দেওয়া গেছে। ঐ ছবিগুলির জন্য আমরা ভারতীয় যাদুঘর, গুরুসদয় সংগ্রহশালার অবেক্ষক এবং অপরাপর কর্মীদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

- প্রবন্ধগুলিতে হয়তো অল্প-বিস্তর পুনরুক্তি দেখা যেতে পারে — সম্পাদক হিসাবে সেগুলিকে কাটছাঁট করে সবাইকে এক মতের মাপের বানিয়ে নিতে পারতাম। তা করা হয় নি, এই জোরের কাজকে আমি বর্বরতা মনে কবি।
- এই গ্রন্থের পরিকল্পনা আমার, লেখক নির্বাচনও আমি করেছি এবং লেখকেরাও সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করে বিচিত্র একটি বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে আলো ফেলেছেন। সম্পাদক হিসাবে এবং পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।
- প্রচ্ছদের মূলভাব সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' থেকে নেওয়া। তাকে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করার দায় সম্পাদকের।



☐ এই সংকলনে কি আছে ☐

দাঁড়কাক

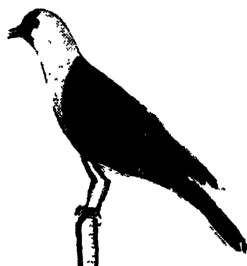
খুঁজে তারে মর মিছে——পাড়াগাঁব পথে তারে পাবে নাকো আর;
রয়েছে অনেক কাক এ উঠানে——তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর;——অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত,——সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব; আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার:
রাত না ফুবাতে সে যে কদমের ডাল থেকে দিয়ে যেত ডাক,——
এখানো কাকের শব্দে অন্ধকাব ভোরে আমি বিমনা, অবাক
তার কথা ভাবি শুধু, এতদিনে কোথায় সে? কি যে হ'ল তার

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ ঘাস
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কচি তালশাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ——ধোঁয়াওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব?——অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে——নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত!

জীবনানন্দ দাস: 'রূপসী বাঙলা'

কাক-কথা

ধীরেন রায়



প্রাণী জগতে কাকের স্থান :

পর্ব – কর্ডাটা। উপপর্ব – ভার্টিব্রাটা। অধিশ্রেণী – ন্যাথোস্টোমাটা।
শ্রেণী – অ্যাভিস্। উপশ্রেণী – নিওর্নিথিস্। অধিবর্গ – নিওগন্যাথি।
বর্গ – প্যাসারিফর্মিস্। গোত্র – করভিডি। উপগোত্র – করভিনি।
গণ – করভাস্ [*Corvus*]।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য : এ জাতীয় পাখির নাসারন্ধ্র ঠিক কপালের নিচে হয় না, উপরের ঠোঁটের ঠিক মাঝে হয় এবং ১২–১৪ টা নাসা-লোম দ্বারা ঢাকা থাকে। চঞ্চু লম্বা, কঠিন, পুরু ও সরল; উপরের চঞ্চুর উচ্চতা কিছুটা বেশি। ডানা দীর্ঘ, পুচ্ছ মাঝারি; পুচ্ছের আগা কতকটা গোলাকার, পায়ের ডাঁটি দৃঢ় হয়। এরা যেমন সহজে শাখা-প্রশাখায় বসতে পাবে, তেমনি মাটিতে চলতেও পারে। ঝাঁক বেঁধে একত্রে বাস না করলেও বিপদকালে এদের মধ্যে দলীয় সংহতি দেখা যায়। একটি কাকের বিপদে বহু কাক দলবদ্ধভাবে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। কাক দূষিত পদার্থ ও আবর্জনা খেয়ে মানুষের যথেষ্ট উপকার করে; সেই জন্যে এদের 'ঝাড়ুদার পাখি' বলে।

প্রকার ভেদ : ভারতবর্ষে নানা ধরনের কাক দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে পাতিকাক, ডোম কাক, দাঁড় কাক ইত্যাদি অনেক বেশি দেখা যায়।

১. *পাতিকাক*— [**বৈজ্ঞানিক নাম** — *Corvus splendens*]

বাঙলার এই কাক 'কাগ্', 'কাউয়া,' 'কাগা', 'কেগো' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর প্রদেশে এদের 'পাতি কাউয়া' ও 'দেশি কাউয়া'ও বলে।

বৈশিষ্ট্য : এদের কপাল, মস্তক ও মুখমণ্ডল চক্চকে কালো রঙের এবং ঘাড়, গলা, পিঠ, বুক ও পেট ফ্যাকাশে বর্ণের, লেজ ও ডানা কালো রঙের; গলার পালক কমই থাকে; কালো রঙের পালকগুলিতে বেগুনি ও সবুজ রঙের দাগ আছে। ১৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি এদের দৈর্ঘ্য, লেজের পালক ৭ ইঞ্চি, ডানা ১১ ইঞ্চি, পায়ের আঙুল প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা।

বিস্তার : হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্যন্ত সব জায়গায় এই কাক দেখা যায়।

বাসস্থান ও স্বভাব : শহরে, গ্রামে ও জনাকীর্ণ স্থানে এবং অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধভাবে একত্রে বাস করে। কোন উঁচু গাছে এরা প্রায় ১০০/২০০ সংখ্যায় রাত কাটায়। ডিম পাড়লে পুরুষ ও স্ত্রী কাক বাসায় থাকে, কিন্তু অন্যান্যরা গাছে বসেই রাত কাটায়। সূর্যাস্তের পর বহুদূর থেকে এমন কি ১০/২০ মাইল দূর থেকে এসে কোন এক গাছে দলবদ্ধ হতে থাকে এবং ২/৩ প্রহর পর্যন্ত কে কোন ডালে বসে ঘুমাবে. তা স্থির করার জন্য 'কা কা' শব্দে চারিদিক মাতিয়ে রাখে। রাত্রি শেষে আশ্রয় ত্যাগ করে খাদ্যের সন্ধানে নানা দিকে উড়ে যায়। যাবার সময় ৩০/৪০ টা কাক একত্রে এক এক দিকে চলে যায়।

বৈশাখ থেকে ভাদ্রের মধ্যে এরা ডিম পাড়ে। এক একটা গাছে বড় জোর ৩টে কাক বাসা বাধে। কাঠি-কুটো দিয়েই এরা সাধারণত বাসা বাঁধে, কিন্তু কলকাতার মধ্যবর্তী কাকের বাসায় টিনের টুকরো, সোডাওয়াটারের বোতল এমনকি চশমার ফ্রেমও দেখতে পাওয়া যায়। এরা একেবারে চারটে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ঈষৎ সবুজবর্ণের ও গায়ে ধূসর বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে।

এরা খুব চতুর, বুদ্ধিমান ও দ্রুত উড়তে পারে। এদের প্রতি কেউ যদি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে উড়ে পালায়। খুব সন্দিগ্ধ চিত্ত, ফলে সামান্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকলে সেদিকে আর যায় না। স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখলে বা বন্দুকের শব্দ শুনলে চিৎকার চেঁচামেচি করে সেখানে অনেকে মিলিত হয়।

কাক ফিঙের *[Dicrurus adsimilis]* সঙ্গ পছন্দ করে না। ফিঙে দেখলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করে, ফিঙেও পিছনে পিছনে উড়তে থাকে। একে 'কাকের পিছনে ফিঙে লাগা' বলে।

খাদ্যাভ্যাস : মানুষের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই এরা প্রধানত জীবন নির্বাহ করে। কিছু কাক লোকালয়ে খাদ্যের সন্ধানে যায়, কিছু নদীতীরে কাঁকড়া, ছোট মাছ ও কীটপতঙ্গ ধরতে যায়, কেউ কেউ মাঠে গিয়ে গবাদির শরীরজাত কীট খায়; কতকগুলো মৃত জন্তুর দেহাবশেষ খেয়েও থাকে। এরা বর্ষাকালে সন্ধ্যের সময় 'বাদলাপোকা' ধরে খেয়ে থাকে।

২. *ডোমকাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus corax*]
কাকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতের উত্তরাঞ্চলে এদের বেশি দেখা যায়। হিমালয়ের ১৪০০০ ফুটের উপরেও ডোমকাক বাস করে।

গঠন বৈশিষ্ট্য : এদের গা গাঢ় নীলবর্ণের আভাযুক্ত চক্‌চকে কালো রঙের। গলায় পালক লম্বা ও স্বল্প পরিমাণে থাকে, ওপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, উপরের ঠোঁটের উচ্চতাও বেশি; ডানা ১৫ ইঞ্চি লম্বা, দেহ দৈর্ঘ্যে ২৫--২৭ ইঞ্চি।

বাসস্থান ও স্বভাব : উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এরা খড়কুটো দিয়ে মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় গাছের মাথায় বাসা বাঁধে। প্রায় পৌষ থেকে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে সবুজবর্ণের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের।

২.ক. *ভোটদেশীয় ডোমকাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus tibetanus*]

হিমালয়ের উর্ধ্বতম প্রদেশে, কাশ্মীর, কুমায়ুন রাজ্যে এবং তিব্বতে এ জাতীয় কাকেদের দেখা যায়।

গঠন-বৈশিষ্ট্য : ওপরের চঞ্চুর উচ্চতা খুব বেশি, পুচ্ছও লম্বা। এরা দৈর্ঘ্যে ২৮ ইঞ্চি এবং ডানা ১৯ ইঞ্চি।

২.খ. *পাটলচুর ডোমকাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus umbrinus*]

মরুপ্রদেশে এসব কাকের আধিক্য।

গঠন বৈশিষ্ট্য : এদের কপাল ও মস্তক পাটলাভ পিঙ্গল বর্ণের এবং কতকাংশে বেগুনি রঙের চক্‌চকে দাগ থাকে; ডানার উপরের স্তরের পালক উজ্জ্বল কালো রঙের এবং নিচের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণের। এদের দেহের দৈর্ঘ্য ২২ ইঞ্চি।

৩. *দাঁড় কাক :*
উত্তর ভারতে এই কাক 'দাড়' বা 'দাল কাউয়া' এবং দক্ষিণে 'ধেরি কাউয়া' নামে পরিচিত। বেশ কয়েকপ্রকার দাঁড় কাক দেখতে পাওয়া যায় :

৩.ক. *ভারতীয় দাঁড়কাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus macrorhynchus*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : শরীরের উপরের দিকের পালকগুলি চক্‌চকে ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণের; ডানা খুব দীর্ঘ ও প্রায় পুচ্ছের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ওপরের ঠোঁটের

সম্মুখভাগ উঁচু ও অগ্রভাগ বাঁকানো ; ঘাড় ও চোখের পাশের পালক চক্‌চকে নয়। এদের ঠোঁট, পা ও আঙ্গুল কালো রঙের। দেহের দৈর্ঘ্য ১৯ ইঞ্চি, ডানা ১১ থেকে ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৭ ইঞ্চি।

বাসস্থান ও স্বভাব : ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বনে, পর্বতে, লোকালয়ে এরা বাস করে।

প্রধানত মৃত জন্তুর মাংসাদি খেয়ে থাকে। ডিম পাড়ার সময় কোন দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে একটি নিরুপদ্রব গাছে বাসা বাঁধে। বাসায় শুষ্ক ঘাস, পাতা ও লোম দিয়ে কোমল ও উষ্ণ করে। একেবারে ৩/৪ টি ডিম পাড়ে, ডিম সবুজ বর্ণের এবং গায়ে ধূসর বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। এদের ডিম পাড়ার সময় বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, এদের বাসাতেও কোকিল ডিম পেড়ে যায়।

৩.খ. *ইউরোপীয় দাঁড়কাক*— [বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus corone*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : দেখতে ঠিক এদেশীয় দাঁড়কাকের ন্যায়, কেবল গায়ের সর্বত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, গালের পালক নরম নয়। সমস্ত শরীর চক্‌চকে। লেজের পালক দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি, ডানা ১২–১৪ ইঞ্চি এবং ঠোঁট প্রায় ৩ ইঞ্চি।

বাসস্থান ও স্বভাব : ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরে এই জাতীয় কাক বাস করে। এরা দল বেঁধে বাস করে না।

৩.গ. *কাশ্মীরী দাঁড়কাক*— [বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus intermedius*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : দাঁড়কাকের থেকে ছোট, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো।

বাসস্থান ও স্বভাব : সিমলা প্রদেশে, কাশ্মীরে ও দুগসাই উপত্যকায় এদের বাস। অতিদ্রুত উড়তে পারে। গলিত মাংস খায়, চিলকে এরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

৩.ঘ. *সূক্ষ্মচঞ্চু দাঁড়কাক*— [বৈজ্ঞানিক নাম — *Corvus tenuirostris*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : গায়ের রঙ বেগুনি মিশ্রিত কালোবর্ণের। মস্তক, ঘাড়, পিঠ, উদর ও চোখের রঙ অপেক্ষাকৃত হাল্কা। কপাল কিন্তু গাঢ় কালো রঙের। দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি, ডানা ১২.৫ ইঞ্চি, লেজ ১৭ ইঞ্চি।

৪. *ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্য কাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম—*Corvus insolens*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : এদের কপাল, মাথা ও গলা গাঢ় কালো রঙের। ঘাড় ও চোখের পাশ হাল্কা বেগুনি রঙের এবং কান-ঢাকা পালকগুলো বেগুনি ও কালো রঙ মেশানো।

বাসস্থান ও স্বভাব : ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মারগুই পর্যন্ত, পশ্চিমে আসাম থেকে মণিপুরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত দেশে এদের বাস। এদের স্বভাব ভারতীয় গ্রাম্য কাকের ন্যায়।

৫. *ঝোটন কাক*—[বৈজ্ঞানিক নাম—*Corvus cornix*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : মাথায় কাকাতুয়ার ন্যায় ঝুঁটি আছে। এদের মাথা, ঘাড়, গলা, বুকের ওপরের দিক, ডানা, লেজ চক্‌চকে। বাকি দেহের পালক ধূসর বর্ণের।

দৈর্ঘ্যে এরা ১৯ ইঞ্চি, লেজ ৭.৫ ইঞ্চি, ডানা ১২ ইঞ্চি, ঠোঁট ২ ইঞ্চি লম্বা।

বাসস্থান ও স্বভাব : শীতকালে এরা পাঞ্জাবের সর্বাপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম কোণে, হাজারা প্রদেশে ও গিলগিট প্রান্তে বাস করে। গলিত মাংসভুক। এদের অনেকে আবার শস্যভোগী এবং শস্যের আশায় এরা দলে দলে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ভারতবর্ষে এঁরা বাসা বাঁধে না বা ডিম পাড়ে না। সাইবেরিয়ায় এরা গলিত মাংসভুক শ্রেণীর কাকের সঙ্গে জোড় বাঁধে। অবশ্য এই বর্ণশঙ্কর কাক এদেশে দেখা যায় না।

৬. *শ্বেত কাক*—কাকের মতো একই রকম দেখতে একপ্রকার পাখি আছে, যাদের সমস্ত পালক কাকাতুয়ার মতোই সাদা; পা, ঠোঁট, চোখও কাকাতুয়ার মতো। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এই রকম কাকের উল্লেখ আছে।

৭. কাশ্মীরে, পশ্চিম এশিয়ায় ও ইউরোপে আর একপ্রকার দাঁড়কাক দেখা যায়, যাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Corvus frugilegus*

গঠন বৈশিষ্ট্য : সমস্ত দেহের বর্ণ কালো; মাথা, গলা, ঘাড় ও নিচের দিকের পালক নীল রঙের।

স্বভাব : প্রধানত শস্যভোজী, দলে দলে মাঠে ঘুরে বেড়ায় এবং খাল, বিল ও জলাশয়ে কীটপতঙ্গ ধরে খায়।

৮. ***ক্ষুদ্রচঞ্চু দাঁড়কাক***— [**বৈজ্ঞানিক নাম** — *Corvus monedula*]

গঠন বৈশিষ্ট্য : মাথা, কপাল চক্‌চকে কালো রঙের; ঘাড় গাঢ় ধূসর বর্ণের, মাথার পাশ ও গলা হাল্কা ধূসর বর্ণের, গলার প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত সাদারঙের কাঁঠি আছে। দৈর্ঘ্য ১৩ ইঞ্চি, লেজ ৫.৫ ইঞ্চি, ডানা ৯ ইঞ্চি, ঠোঁট ১.৫ ইঞ্চি।

বাসস্থান ও স্বভাব : কেবল কাশ্মীর ও উত্তর পাঞ্জাবে এদের দেখা যায়। পুরনো বাড়িতে ও গাছে এরা বাসা বাঁধে; ৪ থেকে ৬টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি। এই কাক বেশ জনপ্রিয় এবং পোষ মানে। এরা ময়না পাখির মত কথা বলতেও শেখে।



কাক ও সংস্কৃতি

কাকচরিত্র

ও কাক তন্ত্রসার

মিঅলাভ

বায়ু উত্তর ঈশান

পশ্চিম পূর্ব

নৈঋত দক্ষিণ অগ্নি





প্রচ্ছদচিত্র

কাকচরিত্র

ও কাক তন্ত্রসার

মিত্রলাভ




বায়ু উত্তর ঈশান

পশ্চিম পূর্ব



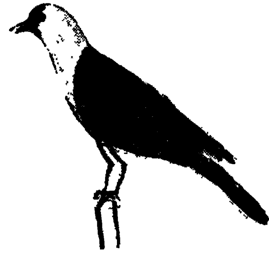
নৈঋত দক্ষিণ অগ্নি




প্রচ্ছদচিত্র

কাক : 'বিশ্বকোষ'-এ

নগেন্দ্রনাথ বসু



কাক কে ? :

পুংলিঙ্গ [√ কৈ শব্দ করা + ক (কন্)-ক, উনাদি সূত্র ৩.৪৩ ; ধ্বন্যাত্মক ; স্ত্রী 'কাকী']।

১.১ **কাকের কত নাম :** করট। অবিষ্ট। বলিপুষ্ট। সকৃৎপ্রজ। ধ্বাঙ্ক্ষ। আত্মঘোষ। পরভৃৎ। বলিভুক্। বায়স। বাতজব। বল। দীর্ঘায়ু। সূচক। কৃষ্ণ। গ্রামীণ। পিশুন। কটখাদক। দ্বিক্। কাণ। ধূলিজঙ্ঘ। নিমিত্তকৃৎ। কৌশিকারি। চিরায়ু। মুখর। খর। মহালোল। চিবঞ্জীবী। চলাচল। করটক। নাগবীক্ক। গূঢ়মৈথুন। লন্টাক। শ্রাবক। রতজ্বর।

১.২ **পরিচয় :** পৃথিবীর উত্তরাংশে প্রায় সর্বত্রই কাক দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই কাক আছে। বঙ্গদেশে কাক শব্দটি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় : কাক, কাগ্, কাগা, কাউয়া, কোগো ইত্যাদি। আকৃতি, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ভেদে কাককে অনেকগুলি ভাগে করা করা যায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের বিভাগগুলি হলো : পাতিকাক, দাঁড়কাক, ডোমকাক, কড়িয়াল ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্য শাকুনশাস্ত্রানুযায়ী কাক Corvidoe ['করভিডি'] বিভাগের অন্তর্গত Corvinœ ['করভিনি'] শ্রেণীভুক্ত Corvus ['করভাস'] জাতীয়। পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণ এদের শারীরগঠনের নানারকম বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১.৩. **স্বভাব-আচার-ব্যবহার :** কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর যে বিশেষ বন্ধুতা দেখা যায়, তাহা নহে। নগরে, গ্রামে ও বহুজনাকীর্ণ স্থানে ইহারা অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। ঐ সকল স্থানের নিকটবর্তী কোন বৃহদবৃক্ষে ইহারা প্রায় ১০০/২০০ মিলিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা গর্ভিণী না হইলে কেহ বাসা বাঁধে না। ডিম পাড়িলে কেবল স্ত্রীপুরুষ দুইটাই বাসায় যায়। অন্য সকলে গাছে বসিয়া রাত্রিযাপন করে।...

...ইহারা মনুষ্যের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, তাহার কোন্ বাড়িতে কখন খাদ্যাদি পাক

হয়, কখন কে ভোজনাবশেষ বহির্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশ জানে, এবং সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। সকলেই এ সকল জানে কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হয় না। কতকগুলি ঐরূপে লোকালয়ে ভ্রমণ, কতকগুলি নদীতীরে কাঁকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মৎস্য বা কীটাদি ধরিতে গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া গবাদির শরীরজাত কীটাদি, অথবা পক্ক শস্যকণা খাইতে যায়, কতকগুলি কোথায় কোন মৃতজন্তুর শরীর পড়িয়াছে তাহার অন্বেষণে গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যাদি বৃক্ষে ফল পাকিলেও তাহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা সকালবেলা 'বাদলাপোকা' উড়িলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, ইহারা দলে দলে আসিয়া সেই পোকা ধরিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন ৮/১০ ঘটিকা অতীত হইলেই ইহারা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া অট্টালিকার ছাদে বা বৃক্ষাদির ছায়ায় বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁফাইতে থাকে, রৌদ্র পড়িলে আবার ভ্রমণে বাহির হয়।...

...বৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে।...ইহারা একেবারে চারিটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ঈষৎ সবুজবর্ণ ও তাহার গাত্রে ধূসরবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। 'কাগডিমী' বং দেখিতে বড় সুন্দর।...কাকেরা শাবককে অনেকদিন পর্যন্ত আহার দিয়া থাকে। কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে।...

ইহারা বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহাদের ধূর্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে। ইহারা এতদূর নির্ভীক যে, মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিড়াল বসিয়া আছে, অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্নপাত্র হইতেই অন্ন লইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। ইহাদের প্রতি কেহ যদি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পালায়। ইহারা বড়ই সন্দিগ্ধ চিত্ত, সামান্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলে সে দিকে বড় যায় না।

ইহারা স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে মহাকোলাহল করিয়া সেইস্থানে একত্র হয়। স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ ঘটিলে ইহারা জড় হইয়া কোলাহলে সেইস্থান বিরক্তিকর করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ তাহার কোন একটা শেষ ফল দেখিতে না পায়, ততক্ষণ কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না। ইহারা বড় পরিহাস-প্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র মিলিত হইয়া চিল, শকুনি বা অন্যান্য পক্ষীকে ঠোক্‌রাইয়া তাহাদের লাঙ্গুল টানিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে।

ইহারা ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়, ফিঙ্গাও পশ্চাতে পশ্চাতে উড়িতে থাকে। ইহাকেই 'কাকের পিছনে ফিঙ্গা লাগা' বলে।

হিন্দুর নবান্ন পর্বে এই কাকের বড় আদর। প্রত্যেক গৃহস্থ 'নবান্ন' লইয়া গৃহছাদে উঠিয়া কাকেব আগমন প্রার্থনা কবিতে থাকেন, কিন্তু সে দিন ইহাদিগকে পাওয়া দায় হয়, কারণ প্রায় সর্বত্রই ভোজ্য পাইয়া তৃপ্ত থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে, 'নবান্নের কাক' অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য।

১.৪. কাক কত রকম:

১.৪.১. *পাতিকাক:* 'বাঙলায় সাধারণত যে কাক দেখা যায়, তাহাকে বাঙালিরা 'পাতিকাক' বলে। উত্তবপ্রদেশে ইহাদিগকে 'পাতিকাউয়া' ও 'দেশি কাউয়া' বলিয়া থাকে। দক্ষিণাত্যেও এই কাক আছে। তৈলঙ্গীবা 'করবীকাকা', 'কাকুন' ও 'গ্রণা' এবং মণিপুরীরা 'মানকোয়াক' বলে।

১.৪.২. *ডোমকাক:* 'করভাস' জাতির মধ্যে ডোমকাক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষেব মধ্যে উত্তবাঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি কয়েক স্থানে ইহারা গ্রীষ্মকালে থাকে না। শরতের প্রথমে ইহারা আসে ও বসন্তের পরেই আফগানিস্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়া যায় ও হিমালয় পর্বতের ১৪০০ ফুটের উর্ধ্বে ডোমকাক আছে; কিন্তু তন্নিম্নে পার্বত্য-প্রদেশে নাই। বাঙলায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে সেরূপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়।...

...হিমালয় ও ইউরোপে যে ডোমকাক দেখা যায়, তাহারা বড় ভীত-স্বভাব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাহে না, কিন্তু ভারতে অন্যান্য স্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহারা পাতিকাকেব ন্যায় নির্ভীক, ঘরে দুয়ারে ইচ্ছামত যাতায়াত করে। ডোমকাকেরা কিন্তু বড় দ্বন্দ্বপ্রিয়। ইহারা কলহ কবিতে এতদূর উন্মত্ত হয় যে উভয়ের মধ্যে একটা প্রায়ই মারা পড়ে। সিন্ধুপ্রদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাদের অনেকগুলি মারা পড়ে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাদের স্বভাবসুলভ দ্বন্দ্বপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। সিন্ধুপ্রদেশের ডোম কাকেরা জাতিগত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টাধ্বনির মত এক প্রকার শব্দ করিতে পাবে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহারা কাঠিকুটা দিয়া মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাসা বাঁধে। ইহারা ৪।৫টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ;

ডিমের গাত্রে কৃষ্ণাধিক্য মেটে রঙের তরল, বেগুনি রঙের ও সিন্দুরিয়া রঙের দাগ আছে।'

১.৪.৩. *ভোটদেশীয় ডোমকাক:* হিমালয়ের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে কাশ্মীর ও কুমায়ুন রাজ্যে এবং তিব্বত দেশে একজাতীয় ডোমকাক আছে; ...দুই চারিজন বৈদেশিক শাকুন শাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক স্বতন্ত্রজাতি বলিয়া গণনা করেন ও 'করভাস টিবেটেনাস' [Corvus Tibetanus] অর্থাৎ 'তৈব্বতী ডোমকাক' নামে অভিহিত করেন; কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘতা ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্নতা নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ শ্রেণী-মধ্যে গণ্য করেন।

'য়ুরোপীয শাকুনতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ডোমকাক [র‍্যাভেন—raven] মানুষের কণ্ঠস্বর অতিসুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

১.৪.৪. *পাটলচূড় ডোমকাক:* মরুপ্রদেশে আর একপ্রকার ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের কপাল ও মস্তক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ ও কতকাংশে বেগুনি রঙের চিক্কণতা আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নস্তরের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণের পালকগুলির প্রান্তভাগ রক্তাভ। চঞ্চুপুট কাল, পদদ্বয় কাল।...

১.৪.৫. *ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্যকাক:* ইহাদের কপাল, মস্তক, চিবুক ও গলা চিক্কণকৃষ্ণ। ঘাড় ও চঞ্চু-পার্শ্ব তরল পিঙ্গলবর্ণ এবং কর্ণাবরক পালকগুলি ও নিম্নদেশের পালকগুলি পিঙ্গলাভ মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনি ও সবুজবর্ণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভা বাহির হয়। ইহাদের স্বভাবাদি ভারতীয় গ্রাম্য-কাকের ন্যায়। ইহাদের ব্রহ্মদেশীয় নাম 'কীগ্যান'...।

১.৫. *দাঁড়কাক:* এই জাতীয় কাককে উত্তর ভারতে 'দাঁড়' বা 'দাল কাউয়া' ও দক্ষিণে 'ধেরি কাউয়া' বলে। যাহারা শীক্‌রে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্দারা পক্ষী শিকার করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে 'কড়িয়াল কাক' বলে...।

দাঁড়কাকের কয়েকটি শ্রেণীভেদ আছে :

১.৫.১ ভারতীয় দাঁড়কাকগুলির আকার এইরূপ — সমস্ত শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিক্কণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ;....ইহাদের ঠোঁট, পা ও অঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ।...ইহাদের বাসাতেও কোকিল ডিম পাড়ে। ইহারা বড় অনিষ্টকারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোরগ, পায়রার ছানা ও চড়াই ধরিয়া লইয়া যায় এমন কি ক্ষুদ্র

ছাগ শিশু পর্যন্ত ইহাদের চঞ্চুপুটাঘাতে মারা পড়ে, ইহারা অপর পক্ষীর বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে আসিলে 'বাজকাক' ইহাদিগকে তাড়া করে।

১.৫.২. য়ুরোপীয় দাঁড়কাক অর্থাৎ গলিত মাংসভুক্ 'কাক'...।

১.৫.৩. কাশ্মীরে আর এক শ্রেণীর দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাদ।...ইহারা পার্বতীয় কাক নামে বিখ্যাত।

১.৫.৪. *সূক্ষ্মচঞ্চু দাঁড় কাক:* গাত্রবর্ণ বেগুনি মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ।

১.৬. *ঝোটন কাক:* ইহাদের মস্তকে কাকাতুয়ার ন্যায় ঝোটন আছে। ইহাদের মস্তক, ঘাড়, গলা, বক্ষের ঊর্ধ্বভাগ, ডানা, পুচ্ছ সরু ও চিক্কণ। ইহাদেরও আবার তিনটি শ্রেণী :

১.৭. *শ্বেতকাক:* কাকের ন্যায় অবিকল আকারের এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহার সমস্ত পালক কাকাতুয়ার ন্যায় সাদা। পদদ্বয়, ঠোঁট এবং চক্ষুও কাকাতুয়ার ন্যায়। ইহাদিগকে শ্বেতকাক বলে।

কাক সম্বন্ধে বাঙলাদেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে:

ক. যদি কোন গৃহস্থের ছাদে বসিয়া একটা কাক আর একটি কাকের গাত্রকীট বাছিয়া দেয় ও মাথার পালক সংযত করিয়া দেয়, আর যদি কোন সধবা পুত্র-সম্ভাবিতা বধূ বা কন্যা তাহা দর্শন করে, তবে গৃহিণীরা স্থির করেন যে সেই মাঘের ঋতুস্নানের পর সেই কামিনী গর্ভিণী হইবে।

খ. কাকের পালক স্পর্শ করিলে পূর্বধর্ম বিনষ্ট হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছুঁইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া থাকেন।

গ. কাক ঝড় ব্যতীত মরে না। 'কাক মরে ঝড়ে, বিড়াল বলে আমার শাপ ফল্লো হাড়ে হাড়ে।' [এই শাপটা কি বা তাহার ইতিহাস আছে কি না জানা যায় নাই]।

ঘ. কাক যখন প্রত্যুষে উঠিয়া ডাকিতে থাকে ও ইতস্তত উড়িতে থাকে অথচ আহার গ্রহণ করে নাই, তখন শুভোদ্দেশে যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়। ডাকের বচনে আছে—উঠে পড়ে খায় না, / তখন কেন যায় না।'

ঙ. 'কাক নাপিত শোয়াল, / এই তিন চতুরাল।'

চ. পক্ষী জাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা শবদেহ পরিষ্কার করে। কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ জাতীয়ও বলেন।

ছ. কাক মাংস তিক্ত, কোন পশুপক্ষীর খাদ্য নাহে। লোকে স্বার্থপরতার তুলনায় বলে, 'কাক সকলের মাংস খায় কিন্তু তার মাংস কেহ খাইতে চায় না।'

মদনপালের মতে ইহার মাংস গুণ—লঘু অগ্নিদ্দীপক, বলকারক, আয়ু ও চক্ষুর হিতকর এবং ক্ষত ও ক্ষয়রোগ—নাশক।

'বিশ্বকোষ' : ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৩ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮—৩৭৩।



কাক : পক্ষী পূজা

উইলিয়াম ক্রুক



পাখি প্রসঙ্গে বলা যায় কাক বিখ্যাত পাখি এবং পবিত্র হিসেবে বিবেচ্য[১]। ভাবতীয় প্রথা অনুযায়ী কাক মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতীক।

উত্তরভাবতে কাককে খাদ্যদান 'কগৌর' নামে পরিচিত এবং 'Manes'-কে খাদ্যবিতবণের সমতুল্য। রামায়ণে রাম সীতাকে এই দানসামগ্রী দিতে আদেশ করছেন এবং যম এই দানের পুরস্কার হিসেবে পিণ্ডভক্ষণে রাজি হয়েছেন। এই কারণে কাককে খাদ্য দেওয়ার পর মৃত ব্যক্তিব আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করতে পাবে। তাই কাক 'বলিপুষ্ট' নামে পরিচিত অর্থাৎ এই পাখি দান-উপজীবী। এছাড়াও এই পাখি 'বলিভুক্' কিংবা উৎসর্গীকৃত অর্ঘের খাদক নামেও পরিচিত।[২]

মহাভাবতে জীবিত কৌরববীরদেব অন্যতম দ্রোণপুত্র এক প্যাঁচাকে কাক হত্যা কবতে দেখেছিলেন পবিত্র মহীরূহে এবং তিনি এর থেকে পাণ্ডবশিবির আক্রমণ করার ইঙ্গিত পান। প্যাঁচা এবং কাকের দ্বন্দ্ব সোমদেবের গল্পের বিষয়বস্তু।[৩]

রামায়ণে দুষ্ট কাকের কাহিনী, যে দুষ্ট কাক সীতার পা দংশন করেছিল, তা ঐ মহাকাব্যে উল্লিখিত। মধ্যভারতের 'ভট্টরা' এক শ্রেণীর ক্রীড়াকুশলী যাযাবর। তারা নারায়ণের পূজক এবং বাঁশ পুজোও করে। এই দিয়েই তাদের কলাকৌশল প্রদর্শিত হত। তারা যখন মৃতদের সমাহিত করতো, মাথার কাছে চাল ও তেল রাখতো[৪] এবং কাছে দাঁড়িয়েই ঐ দান-সামগ্রী যে খেতে আসতো তাকেই উপাসনা কবতো। মৃত সম্বন্ধে তারা সবচেয়ে শুভ ইঙ্গিত পেত সেখানে যদি কাক আসতো।

গরুড় পুরাণে এক দুষ্ট শিকারীর গল্প বলা হয়েছে। গভীর বনে সে বাঘেব হাতে প্রাণ হারায় এবং তার অশরীরী আত্মা উপদ্রবের কারণ হয়ে ওঠে, যতদিন না কাক [তার] একটি হাড় বয়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গবথে চড়ে পুণ্যাত্মাদের বাসভূমে গমন করে পাপী। এই পুরাকাহিনী পাহাড়-অঞ্চলে প্রচলিত এবং [গল্পটি] বলে দেয় কর্মশর্মা কিভাবে প্রাণ হারিয়েছিল। এক কাক তার একটি হাড় তুলে তুঙ্গক্ষেত্রের বেদীতে নিয়ে যায় এবং সেই পুণ্যভূমির মাটির গুণে শিকারীটি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রলোকে বাহিত হয়।[৫]

ভূষুণ্ডী যুদ্ধক্ষেত্রেব পৌরাণিক কাক। সে নিহত যোদ্ধার রক্তপান করে। দেবতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল শুম্ভ-নিশুম্ভ। এই অসুরদের যুদ্ধে ভূষুণ্ডী তখন ক্ষমতাব অতিরিক্ত রক্তপান করেছিল। রামের যুদ্ধেও রক্তপানে সে তার তৃষ্ণা মেটায় : কিন্তু শুকনো-কঠিন মাটিতে তার চঞ্চু ভেঙে গিয়েছিল। এই মাটি তুলনায় অল্পরক্তে সিঞ্চিত, সে রক্ত ছিল মহাভারতের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বীরদের। তারপর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলে, সৈন্যদের ওপর সে ডাকতে থাকলো এবং যতক্ষণ না তার তৃষ্ণা মিটবে শেষ পর্যন্ত, [সে] খোঁজ করতে থাকে কি 'Armageddon'.।

কাক সম্বন্ধে ধারণা বহুবিধ এবং তাদের আকৃতি ও ডাককে ঘিরে যে শুভাশুভবোধ তাও বিভিন্ন। কেউ কেউ মনে করেন কাক একচক্ষু এবং এক অক্ষিগোলক থেকে আরেক গোলকে চোখ সরিয়ে নিয়ে যায় সেটাই তার পক্ষে সুবিধাজনক।

পাঞ্জাবে যদি কোন কাক কোন মহিলার রুমাল তুলে নেয় এবং পরে ফেলে দেয় তবে তিনি তা আর ব্যবহার করেন না, ভিখারিকে দিয়ে দেন।[৬]

কাকের মগজ বার্ধক্যের উপশম। যাত্রারম্ভে কাকের ডাক অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়। কাক যদি ছাদে লাফিয়ে চলে ও ডাকে [তাহলে], মনে করা হয় অতিথির আগমন হবে। মুসলমানরা কাককে একই সঙ্গে ভয় ও শ্রদ্ধা করে, কেননা কাকই 'Cain'কে দেখিয়েছিল কিভাবে 'Abel'-কে সমাধিস্থ করতে হবে।[৭]

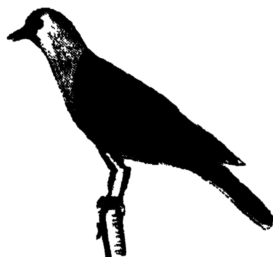
---

1. For the Cow in English folk-lore, See Henderson; 'Folk-lore in Nothern Countries; 126; Gregar, 'Folk-Lore of N.E. 'Scotland' 135.
2. Gubernatis: 'Zoological Mythology'; ii. 253 Sq; Punjab Notes and Queries.'
3. Tawney: 'Kathasaritsagar', P. 64, 73.
4. Balfour: 'Journal: Asiatic Society of Bengal', N S. XIII
5. Monier Williams: 'Brahmanism And Hinduism', 301; Atkinson; 'Himalayan Gazetteer', ii. 329.
6. 'North Indian Notes & Queires'. ii 15
7. 'The Popular Religion And Folk-Lore of Northern India': W. Crooke Vol II. 1896 [Animal Worship'—Bird: The Crow', p. 243—245]—থেকে এই অংশটি অনূদিত হয়েছে।

অনুবাদ : স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাক : বাল্যস্মৃতিতে

ক্ষেত্র গুপ্ত



ক. এক / নবান্নের কাক :

যখন ছোট ছিলাম, ছিলাম পূর্ববঙ্গের এক গ্রামকল্প শহরে, কাকেদের সঙ্গে আমাদের বেশ আত্মীয়তা। বিশেষ করে দাঁড় কাক। সেকালে সব এক ফসলী খেত। নতুন ধান উঠলে বাড়ি বাড়ি লেগে যেত নবান্নের উৎসব। এই উৎসবে আমরা শিশুরা সব থেকে আগে কাককেই বন্ধু করে নিতাম।

শেষ হেমন্তে যখন গাঢ় কুয়াশা জমে থাকত ভোরের গাছ-গাছালিতে, আমরা ছোটরা দোলাই-চাদরে মাথা-কান ঢেকে ঘুরে ঘুরে কাকেদের নিমন্ত্রণ করতাম :

ও কাউয়া কো কো কো
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্‌নো।
আইও বইও চাউল কলা খাইও।
ও কাউয়া কো কো কো
দাঁড় কাউয়ারে কলা দিমু
পাতি কাউয়ারে লাথি দিমু...

এর পরে আরও দু-একটি চরণ ছিল যা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

সে যা-ই হোক, ভোরের আলো-অন্ধকার ভেদ করে আশেপাশের অনেক বাড়ি থেকে পৌঁছাত ঐ একই আমন্ত্রণ।

ঘরে চালবাটা নলেন গুড় ডাবের জলে নবান্ন মাখা হত। পুজোটুজো হয়ে গেলে কলাগাছের খোলার তৈরি পাত্রে খানিক 'নবান্ন', একটি খোসা-ছাড়ানো কলা শুদ্ধ বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও ঘন গাছের তলায় রেখে দিতাম। তারপরে আড়ালে গিয়ে অপেক্ষা করতাম যে-পর্যন্ত না কোনো দাঁড়কাক এসে চাল-মাখা খেয়ে ছিটিয়ে কলাটি নিয়ে উড়ে যায়। পাতিকাক যাতে না জোটে সেদিকে আমাদের কড়া নজর থাকত। নিমন্ত্রিত অতিথি কলা ঠোঁটে করে বিদায় নিলে স্বস্তি নিয়ে আমরা ঘরে ফিরতাম—'নবান্ন'

খাবার দুর্বার লোভকে তখন আর ঠেকানো যেত না।

কাল : ৫৫/৬০ বছর আগে। **স্থান :** বরিশাল জেলার অন্তর্গত মহকুমা শহর পিরোজপুর। বর্তমানে বাঙলাদেশের একটি জেলা শহর। **সাক্ষ্য :** জীবনানন্দ দাসের কবিতার চরণ :

'হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।'

খ. দুই / খলনায়ক কাক :

শৈশব-স্মৃতিতে ধরা একটি উপকথা। স্থান-কাল আগেই বলা হয়েছে। মা-ঠাকুমার মুখে শোনা। কোনো উপকথা-সংগ্রহে এটি আমার চোখে পড়েনি।

এক ছিল চিংড়ি। একদিন সে পদ্মপাতায় বসে নবান্ন খাচ্ছিল। এমন সময় এক কাক এসে বলল—ওলো তোরে খাই।

খাবি তো খাবি, লো বললি কেন। চিংড়ির সম্মানে খুব লাগল। সে নদীর বাঁকে ইলিশের বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির।

—ইলিশ দাদা ইলিশ দাদা ঘরে?

—এত রাত্তিরে কে ডাকাডাকি করে?

—আমি ইচলে রানী।

—দাও বোনকে পিঁড়ি-পানি।

—তোমার পিঁড়ি-পানিতে আগুন লাগুক। আমি একটি কার্যে এসেছি।

—কি কার্যে বোনটি?

—আমি পদ্মপাতায় বসে নবান্ন খাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা কাক এসে বলে কি—ওলো। তোরে খাই। খাবি তো খাবি লো বললি কেন?

—কি লো বলেছে? এত বড় অপমান। এর বিহিত করতে হয়। কিন্তু আমি একটু ব্যস্ত আছি। তুমি বরং রুই দাদার কাছে যাও।

চিংড়ি দিঘির কিনারে রুই মাছের বাড়ির দরজায় হাজির।

—রুই দাদা, রুই দাদা ঘরে?

[এর পরে হুবহু একই কথাবার্তা। শুধু রুই মাছের শেষ কথাটি পৃথক—]

—তুমি বরং কাঁকড়া দাদার কাছে যাও।

কাঁকড়া দাদা থাকে পুকুর পাড়ে গর্তের মধ্যে। তার সামনে গিয়ে চিংড়ি ডাকল :

—কাঁকড়া দাদা কাঁকড়া দাদা ঘরে?

[এর পরে একই কথাবার্তা। শুধু কাঁকড়ার শেষ কথাটি পৃথক—]

—আচ্ছা তুমি একটা কাজ কর। এক পয়সার মুড়ি কিনে এই গর্তের চারধারে ছড়িয়ে দাও।

যা বলা চিংড়ি তাই করল। এক পয়সার মুড়ি কিনে কাঁকড়ার গর্তের চারধারে ছড়িয়ে দিল। আর নিজে একটা পাতার পেছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল।

মুড়ির লোভে কাক এসে হাজির। গর্তের চারধাবে ঘুরে ঘুরে সে একটা একটা মুড়ি ঠোঁটে তুলে খেতে লাগল। হঠাৎ তার একটা পা পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। কাঁকড়া অমনি শক্ত দাঁড়া দিয়ে পা-টা চেপে ধরল। যন্ত্রণায় কাকটা কা-কা করে চেঁচাতে লাগল। আচমকা কি ঘটে গেল সে বুঝতেই পারল না।

চিংড়ি আনন্দে আটখানা। সে লাফাতে লাগল আর বলতে লাগল :

টেঁপো দাদা কাঁকড়া দাদা।
আমাব সকল দাদায় হারল
আমাব কাঁকড়া দাদায় পারল।
টেঁপো দাদা কাঁকড়া দাদা।

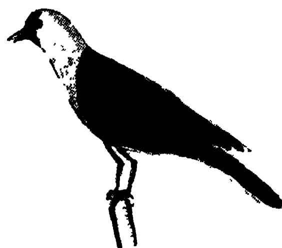
শুনেই কাক চেঁচানো থামাল। চোখ নামিয়ে গর্তের মধ্যে দেখল, একটা কাঁকড়া তার ঠ্যাং চেপে ধরেছে। সে তার শক্ত ঠোঁট গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে কাঁকড়াটাকে ধরে টেনে তুলল। তার পরে সেটাকে নিয়ে ডানা মেলে দিল আকাশে।

মনের দুঃখে চিংড়ি টুপ করে ডুব দিল জলে।



কাক : কতো কথা

সনৎকুমার মিত্র



১.

কাক-চরিত্র :

'শকুনবিদ্যা' বা 'শাকুনশাস্ত্র' প্রাচীন ভাবতে পাখিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিলো। জনৈক বসন্তরাজ কর্তৃক এই শাস্ত্র বচিত হয়েছিলো বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই শাস্ত্রে মনে করা হয় কিছু পাখির রব, আচার-আচরণ, দেহেব বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অঙ্গভঙ্গী বা অংশ-বিশেষ, ডিম ইত্যাদি নানা শুভ ও অশুভের দ্যোতক। পাখিকে কেন্দ্র করে ঐ-সব তথ্য নির্ণয় করতে পারেন যাঁরা তাঁরা 'শাকুনিক' এবং যে গ্রন্থে তা-ব্যাখ্যা-উদাহরণ সহ লিখিত আছে তাকে 'শাকুনশাস্ত্র' বলে। এই শাস্ত্রেব মধ্যে সবচেয়ে পরিপুষ্ট অংশ হচ্ছে কাক নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়েছে। তা-ই 'কাকচরিত্র' নামে পরিচিত ['কাকচরিত্রং বর্ণিত যত্র']।

এই পাখিটির ডাকে বৈশিষ্ট্য, বাসা তৈরির সময়, তাকে দেখতে পাওয়ার দিনক্ষণ, তার ডিম পাড়ার সংখ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি তার সমস্ত রকম আচরণ-চেষ্টাদিকেই শুভাশুভের, লাভ-ক্ষতির কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থে করা হয়েছে। 'বৃহৎ সংহিতা'র ৯৫-তম অধ্যায়ে 'কাকচবিত্র' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'কাক-চরিত্র এবং কাকতন্ত্র বিদ্যা ভারতেব নিজস্ব সম্পদ। এই বিদ্যা দুটির গুরুত্বের কোন সীমা নেই বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তন্ত্রবিদ্যাকে বহুবিধ শাখায় বিভক্ত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাক-চরিত্র ও কাকতন্ত্র, তন্ত্রবিদ্যা শাখাসমূহের একটি শাখা।'...

...পূর্বেই বলা হয়েছে, তন্ত্রবিদ্যা এক অতি জটিল বিদ্যা। এই বিদ্যা—পশুপাখির সাহায্যেও প্রয়োগ করা সম্ভব। পশুপক্ষীর ডাক শুনে তাদের ভাষার অর্থ বুঝতে পারাও একরকম তন্ত্রবিদ্যা।

প্রাচীন মুনিঋষিরা ঐ বিষয়ে ছিলেন বিশেষ ভাবে দক্ষ। কাক-এবং- কাকতন্ত্র বিদ্যার উদ্ভবও হয়েছে ঐ ভাবেই। এই কাক চরিত্র বিদ্যা বিষয়ে মহাভারতেও

উল্লেখ আছে। কথাটি বলেছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগরাজকে। কথাটি নিম্নরূপ :

কাকচরিত্রং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তংঋষিবাক্যম।
সখ্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্বতত্ত্বং লভেন্নরং।।

অর্থাৎ, — কাকের চরিত্র সম্বন্ধে আমি যথাযথ ভাবে ঋষি বাক্যের বিবরণাদি আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ঋষিগণ বলেন, দণ্ড পরিমাণ নির্বিশেষে কাক ধ্বনির শ্রবণে সর্বতত্ত্ব তৎক্ষণাৎ জানা যায়। কাক ধ্বনির তত্ত্বসার অর্থাৎ তাহার অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে প্রথমে কাকের বিভিন্ন রকম ডাকের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আমাদের অতি-পরিচিত, কুৎসিত দর্শন ও কর্কশরবকারী এবং সর্বভুক কাক নামক পাখিটিকে নিয়ে ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকসাহিত্যে এতো আলোচনা হয়েছে যে তার দ্বারা এক মহাগ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে। এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি প্রসঙ্গ-মাত্রের উল্লেখ করবো।

২.

কালিদাসে কাক :

'ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্।। ২২ ।।
তস্মিন্নাস্থাদিষকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ।
ভ্রান্তশ্চমুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ।। ২৩ ।।

[রঘুবংশম্ : ১২ সর্গ]

[অর্থ: হঠাৎ — একটা কাক এসে তাঁর [সীতার] স্তনযুগলে নখের আঁচড় কেটে দিল। স্বামীর উপভোগের চিহ্নে সে যেন দোষ দেখতে পেয়েছিল।। ২২ ।। প্রিয়ার ডাকে জেগে উঠে রামচন্দ্র তার দিকে একটা কাশের তীর নিয়োগ করলেন। কাকও ঘুরতে ঘুরতে একটা চোখ ফেলে দিয়ে মুক্তি পেল।। ২৩ ।। [অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী ও রত্না বসু]

৩.

রামায়ণে কাক :

[সংস্কৃত] জয়ন্ত নামে একটি কাক একাক্ষরূপে পরিচিত ['পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পতভাং বরঃ' রামায়ণ ৫।৩৮।২৮] চিত্রকূটে বাস করার সময়

একদিন রামচন্দ্র সীতার কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ কাক সীতার স্তনে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে। সীতার আর্তনাদে রামের ঘুম ভেঙে গেলে ঐ কাককে লক্ষ্য করে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন ['মৎকৃতে কাকমাত্রে তু ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্।' —ঐ, ৫।৩৮।৩৯]। কাক ভয়ে নানা দেবতা ও ঋষির কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে রামের কাছে এসে আশ্রয় চান। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র বৃথা যায় না; জয়ন্তের ডান চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। পরে রামের বরে কাক ভালো চোখটাকেই যদিচ্ছ ঘোরাতে পারে।

[*বাঙলা : কৃত্তিবাসী*] :

ক.

জয়ন্ত নামেতে কাক আকাশেতে ছিল।
সহসা সীতার গায়ে উড়িয়া পড়িল॥
ভীতা সীতাদেবী তাঁর কাঁপয়ে পরানী।
দুই নখে আঁচড়ে সীতার দেহখানি॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছয় মাসের পথ গেল পর্বত কৈলাস॥
ডাকেন জনকসুতা উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন ভাই সীতাকে কে মারে॥
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতার প্রহারে হেন আছে কোন্ জন॥
মাতার অধিক মোর সীতা ঠাকুরাণী।
আঁচড়িয়া গেল কাক কোথা নাহি জানি॥
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্ খানে।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে॥
হেন কালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক হয়েছি ব্যথিতা॥
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায়॥

ইন্দ্রের নিকট কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বেশেতে সে গেল ইন্দ্রের সাঁই।
কহিলেন আমি সে জয়ন্ত কাক চাই॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম বধিব জীবন।
রক্ষিবে যে জন কাক তাহারি মরণ॥
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণে গোচর॥
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিয়া করিল তার একচক্ষু কাণ॥
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণা সাগর রাম না মারেন পাখি॥
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥'

খ.

'...যজ্ঞভাগ লইবারে এলো দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ॥
ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন নত হয় দেখে তার্ক্ষ্যপাখি॥
না দেখি উপায় কোন যত দেবগণ।
পক্ষিরূপ ধরি সবে হৈল অদর্শন॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস॥
...করিয়া সংগ্রামে জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হতে বাহির হইল॥
পক্ষী হয়ে দেবগণ পেল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ॥
...যম বলে কাক আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাইক রবে মরণের ডর॥
রোগপীড়া তোমার না হইবে সংসারে।

তব মৃত্যু হবে যদি মানুষেতে মারে॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥'

[উত্তরাকাণ্ড]

৪.

কাকের রঙ কালো কেন?

যমুনার এক পারে মথুরা, আর পারে বৃন্দাবন। অক্রুর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা পরম বিরহে দিনপাত করতে থাকলেন। বিরহে তাঁর দিন আর কাটতে চায় না। এদিকে অনেক দিন শ্যামের কোনো সংবাদ নেই। শ্রীরাধার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কী করেন, কী করেন। সংবাদ এনে দেবার কেউ নেই। অষ্টপ্রহর নয়ন ঝরে। শেষে শ্রীরাধা তাঁর নয়নের কাজল দিয়ে তৈরি করলেন এক কাক। সেই কাক তাঁর বেদনার দূতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ নিয়ে এল।

শ্রীরাধার নয়ন-কাজল থেকেই এমনি ভাবে ধরায় কাকের সৃষ্টি হল। কাকের দেহবর্ণ তাই কাজলের মতো কালো। শ্রীরাধার দূতীগিরি করবার জন্যেই কাকের সৃষ্টি হয়েছিল বলে আজও কাক মানুষকে শুভাশুভ নানা সংবাদ এনে দেয়।

৪.১. 'কাকের রঙ কেন কালো, সে বিষয়ে ব্যাখ্যাত্মক 'কথা' আসামের সেমা নাগাদের মধ্যে চলিত আছে: গিরগিটি ও টুনটুনির রেষারেষিতে পাখি আর সরীসৃপদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ বাঁধল; যুদ্ধের এক স্তরে ঈগলের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শঙ্খচূড় ঈগলের হাতে নিহত হল। নিহত শঙ্খচূড়ের মাংস বিজয়ী পাখির দল সবাই ভাগ করে খেল। কাক শঙ্খচূড়ের পিত্তটা খেয়েছিল, তাই তার রঙ হল কালো।

৪.২. 'আও-নাগাদের মধ্যে চলিত 'কথা' এই: সৃষ্টির আদি যুগে সব পাখিদের রঙই এক ছিল। তারপর একদিন পাখিদের রাজা দীর্ঘচঞ্চু এক রাজ ধনেশ সব পাখিদের এক এক রঙের জলে ডুবিয়ে এক এক রঙের করে দিল। কাকের ছিল ভারি সুন্দর রঙ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, হঠাৎ সে পড়ে যায় কালো রঙের পাত্রে, তারপর থেকেই সে হয়ে গেছে কালো।

৪.৩. 'সেমানাগা ও আওনাগাদের 'কথা' দুটিতে কাক পূর্বে কাকই ছিল পরে তার রঙ পরিবর্তিত হয়। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো অঞ্চলের মুসলমানেরা কাকের রঙ কালো হওয়া সম্পর্কে যে 'কথা' উদ্ভাবন করেছে, তাকে কাক

প্রথমে মানুষ ছিল : এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তিব কিছু জিনিস-পত্র গচ্ছিত ছিল। সেই ব্যক্তি যখন তার গচ্ছিত দ্রব্যাদি ফেরত চাইল, তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করল। তার এই অন্যায় কর্ম ও অপরাধের জন্য সে একটি কালো রঙের কাকে পরিণত হল, কারণ, পাপের রঙ কালো।'

৪.৪. 'ছোটোনাগপুরের মুণ্ডারীদের মধ্যে চলিত 'কথা' : মানুষেরা আগে স্বর্গেই থাকত, সেখানে থেকেই সিং বোঙ্গার সেবা করত। একদিন আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে সিং বোঙ্গার চেহারার সঙ্গে নিজেদের সাদৃশ্য লক্ষ করে আর তাঁর সেবা করতে চাইল না। সেই অপরাধে সিং বোঙ্গা মানুষকে স্বর্গ থেকে লাথি মেরে দূর করে দিলেন। যে জায়গায় মানুষরা এসে পড়ল সে জায়গায় অনেক আকরিক লৌহ পেয়ে তা গালাতে লাগল। দিনরাত চুল্লী জ্বলতে থাকায় সবকিছু গেল পুড়ে। তাদের সেই আগুন নেভাতে তিনি কাককে প্রেরণ করলেন। কাকের তখন সাদা ছিল, সেই আগুনে পুড়েই তারা কালো হয়ে গেছে।'

৪.৫. 'হেলেনীয় পুরাণে দেব-দৈত্যের যুদ্ধের দেবতা অ্যাপোলো কাকের মূর্তি ধরে ছিলেন। অ্যাপোলো সূর্যের দেবতা, সূর্য অন্ধকারের বিপরীত, অর্থাৎ শুভ্র এবং গ্রীকরা সূর্যের উদ্দেশে শ্বেত কাকই নিবেদন করত, অতএব মনে হয়, অ্যাপোলো শ্বেত কাকের মূর্তিই ধারণ করেছিলেন। ওই পুরাণ অনুসারে কাকেরা পূর্বে সাদাই কালো করে দেন।' [নির্মলেন্দু ভৌমিক: 'বিহঙ্গচারণা' (১৯৮৫)]

৫.

পুরাণে কাক :

ক. 'কশ্যপ ও তাম্রার একটি সন্তান কাকী। এই কাকী থেকে সমস্ত কাকের জন্ম' [অমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'পৌরাণিকা' : ১ ও ২ খণ্ড]।

খ. 'কাশী রাজার এক কন্যার নাম কলাবতী। দুর্বাসাকে পূজা করে ইনি শিবমন্ত্র পান। ইনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মশীলা। মথুরার রাজা দাশার্হকে [মতান্তরে দশাননকে] বিয়ে করেন। রাজা নিজে অত্যন্ত অধর্মাচারী ছিলেন ; তিনি স্ত্রীর তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। কলাবতী তখন রাজাকে গর্গ মুনির কাছে নিয়ে গেলে মুনি রাজাকে কালিন্দীর জলে ডুব দিতে বলেন। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ তখন এঁর দেহ থেকে কাক রূপে বার হয়ে উড়ে যায়। রাজা নিষ্পাপ হন' [তদেব]।

গ. ভূশুণ্ডি কাক : 'পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাক। আবেগহীন এবং হৃদয়বান কাক। মেরু পর্বতে কল্পবৃক্ষে বাস। আবহমান কাল বেঁচে আছে। দেবলোকে বশিষ্ঠ এই কাকের কথা শুনে দেখতে আসেন। কাক বশিষ্ঠকে চিনতে পারেন। অষ্টমাতৃকারা একবার আকাশে আনন্দে নাচছিলেন; আকাশে আর এক দিকে এদের বাহনেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। অলম্বুষা এক জন মাতৃকা; এঁরা বাহন চণ্ড কাক; এই কাকের ঔরসে এই সময় ব্রাহ্মীর বাহন হংসেরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং যথা সময়ে এদের একুশটি সন্তান হয়। এরা একুশ জন ভূশুণ্ডি কাক। জন্মের পর এরা ব্রাহ্মী, অলম্বুষা, চণ্ড প্রমুখকে প্রণাম করে আসে এবং চণ্ডের নির্দেশে কল্পবৃক্ষে বাস করতে থাকে। অন্যান্য ভাইরা বহু কল্প জীবিত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বীতরাগ হয়ে দেহত্যাগ করে। এই ভূশুণ্ডি কাক বশিষ্ঠকে পাঁচবার জন্মাতে দেখেছে, পাঁচবার পৃথিবীকে জলমগ্ন হতে দেখেছে, কূর্মমূর্তি, বার বার সমুদ্র মন্থন, তিন বার হিরণ্যাক্ষের দ্বারা পৃথিবীকে পাতালে নিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছে। পরশুরাম ও রামকে ছয়বার এবং ছয়টি কলিযুগে বুদ্ধকে ছবার জন্মাতে দেখেছে। ত্রিশবার ত্রিপুর দহন, দু-বার দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হওয়া, মহাদেবের দ্বারা দশ জন ইন্দ্র বধ এবং বাণাসুরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের সাতবার যুদ্ধ করা দেখেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ এঁকে যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত চাইলে কাক বলেছিল সত্যযুগে শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধে স্বচ্ছন্দে সে সৈন্যদের রক্তমাংস খেয়েছিল; লঙ্কার যুদ্ধে তাকে কিছুটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার কষ্টের পরিসীমা ছিল না।' [তদেব]।

ঘ. এই ভুশুণ্ডি কাক সম্বন্ধে আরও সংবাদ এই যে, একদা গরুড় 'ভুশুণ্ডির কাছে রামকথা শোনবার জন্য গিয়েছিলো এবং প্রসঙ্গক্রমে সাতটি প্রশ্ন করে। ভুশুণ্ডি তার সব কটিরই উত্তর ঠিকঠাক দিয়েছিলো। এই উত্তরের মধ্যে অন্যতম হলো :

'...দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি।
জনম জনমই বায়স শরীর ধরি॥

[অর্থ : যে ব্রাহ্মণ (দ্বিজ)-কে নিন্দা করে সে অনন্ত নরক ভোগ করে এবং কাক জন্ম ধরে আবার জন্ম নয়।

....'গেহি উলূক সন্ত নিন্দারক।
মোহালিয়া প্রিয়জন ভানুগত॥

[যে সাধুদের (সন্ত) নিন্দা করে সে পেঁচা হয়ে জন্মগ্রহণ করে]।

৬. 'কালিকাপুরাণে' আছে। দেবী কালিকাকে রাজা নরক বিয়ে করতে চাইলে দেবী শর্ত আরোপ করে: এক রাত্রির মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সানুদেশ পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। কথা মতো কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন কাকেরা ডেকে উঠে সকাল ঘোষণা করে দিলে। দেবীর মান বাঁচল।

প্রায় এই ধরনের কথা বীরভূম জেলার মল্লারপুরে প্রচলিত আছে। সেখানে শর্ত ছিল: এক রাতের মধ্যে খাল কেটে দিতে হবে। কাক অকস্মাৎ প্রভাত ঘোষণা করে। ড. মানস মজুমদার, মল্লারপুর, বীরভূম।

৬.

প্রতীচ্য পুরাণে কাক :

'কাকের রঙ কালো, কালোর কাছাকাছি রঙ হলো নীল। শিথিলভাবে দেখলে নীল ও কালো অভিন্ন, ময়ূরের রঙ নীল। অতএব, কাক ও ময়ূর সমার্থক। ঈশপের গল্পে একারণেই কাক ময়ূরের পালক ধারণ করে ময়ূর হতে চেয়েছিলো। ইন্দ্র হলেন ময়ূর দেবতা। নীল তারকাখচিত আকাশ যেন ময়ূর, তারাগুলো ময়ূর-পালকের চোখ।

'নীল ও কালোর অভিন্নতার জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হন। কাক যেমন ময়ূরে পরিণত হয়, বিপরীত দিকে ময়ূরও কাকে। ইন্দ্র যেমন দেবরাজ, জীউসও তেমনি। প্রাচীন এথেন্সবাসীরা কাক ও জীউসের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করতো! কাজেই ইন্দ্র-জীউস, কাক-ময়ূর এখানে একাকার হয়ে গেছে।

'হেলেনীয় পুরাণে দেব-দৈত্যের যুদ্ধে অ্যাপোলো কাকের রূপ ধরেছিলেন। [তুলনীয়: কৃত্তিবাসী রামায়ণে কাক] তবে অনেকের ধারণা, শ্বেতকাকের মূর্তিই তিনি ধরেছিলেন, কেননা গ্রীক সংস্কার অনুযায়ী শ্বেতকাকই সূর্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। [স্মরণীয়, মঙ্গলকাব্যের কাক] অ্যাপোলো সূর্যদেবতা। এই কাক গ্রীষ্মের সূচনা করে বলে বিশ্বাস করা হয়। সূর্যই বৃষ্টির কারণ, এই জন্যে কাক অনেক সময় বৃষ্টি-দেবতা [Pluerial God]-র প্রতীক' [নির্মলেন্দু ভৌমিক: 'বিহঙ্গচারণা' (১৯৮৫): পৃ. ২৩২—৩৩]।

৭.

কাকের মাংস কে খায়?

কেউ খায় না? কেন? কাকের মাংস নাকি তেঁতো। এমন কি কাকও কাকের মাংস খায় না। আমাদেব দেশের নিরক্ষব-দবিদ্র-অন্ত্যেবাসী কাকমারাবা কাক মেরে খায়। কিন্তু তারা তো সমাজের পেছনের সারির লোক। আর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী উন্নত দেশের লোক যে বেশ তৃপ্তি কবে কাক মেরে খাচ্ছে, তার বেলা?

খবরটা এই রকম: 'জাপানীবা কাক খাচ্ছে এবং খাবাব আসরে সবারই একটি পরিতৃপ্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিসকাটা শহরের মেয়র মি. মেইগ্রেড ইকেডা বললেন, 'খুব সুন্দব এর স্বাদ। ঐ দুষ্টু কাকেবা ব্যাপকহারে শস্য খেয়ে ফেলায় যখন আমাদের খাবাবে টান পডছে তখন ওদেবই খাবাব টেবিলে আনা হলো।' কৃষি বিভাগেব আধিকাবিকেবা বলেছেন যে সমুদ্রের ধারের অঞ্চলগুলিতে বছরে প্রায় ৭৫০০ ডলার শস্য এরা নষ্ট করে ফেলছে। বছর তিনেক আগে প্রথম কাক ধরা আরম্ভ হয় এবং তখন প্রতি মাসে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০টি করে কাক ধরা পড়তো।

ঐ শহবের প্রধান কৃষি-বন ও মৎস্য আধিকর্তা মি. শিগো ফুরুটা জানাচ্ছেন যে, 'প্রথমে আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি ধরা পড়া কাকগুলি নিয়ে। তখন কিছু লোক ঐগুলিকে পেটে চালান করে দেবার পরামর্শ দেন। এগার জন লোককে প্রথমে কাকের মাংস কেমন খেতে তার আস্বাদ নেওয়ার পরীক্ষায় নিয়োগ করা হয়। তাঁদের পুলকিত ও পরিতৃপ্ত মতামত পাওয়ার পর এখন গো-কুক্কুট-বরাহ মাংসের পাশে কাকের মাংসও টেবিলে এসে জায়গা করে নিচ্ছে।

'দি হিতবাদ': রবিবার ১৬ নভেম্বব ১৯৯১।

৮.

'কাকের মাংসে সুক্ত হবে'?

"নিতাইবাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল—'ওসব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ। যেমন জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ—তেমনি মিরচাইমার্গ, করাতমার্গ, লবণমার্গ, একাদশীমার্গ, গোবরমার্গ, টিকিমার্গ, দাড়িমার্গ, স্ফটিকমার্গ, কাকমার্গ—'

নিতাই। কাকমার্গ কি রকম?

নিবারণ। জানেন না? গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিলুম। এক জায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় শ-দুই কাগ ঝামেলা করছে। পাশে একটা লোক হাঁকছে—দো-দো আনে কৌয়ে, দো-দো আনে। ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারী কি মুলতানী কাগ হবে, নিশ্চয় পড়তে জানে। একটা ধাড়ি-গোছ কাগের কাছে গিয়ে শিস দিয়ে বললুম—পড়ো ময়না, চিত্রকোট কি ঘাট পর—সীতারাম —রাধাকিষণ বোলো—চুচ্চুঃ। ব্যাটা ঠোকরাতে এল। কাগ-ওলা বললে—বাবু কৌয়া নহি পডতা। তবে কি করে বাপু? কাগের মাংস তো শুনতে পাই তেতো, লোকে বুঝি সুক্ত বানাবার জন্যে কেনে? বললে—তাও নয়। এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েছে, দু-দু আনা খরচ ক'রে যতগুলি ইচ্ছা কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধনদশা হ'তে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। ভাবলুম মোক্ষের মার্গ কি বিচিত্র! অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই গরিব কাগ-ওলা বেচারা নিজের পরকাল নষ্ট করছে। একেই বলে Conscivation of Virtue। একজন পাপ না করলে আর একজনের পুণ্য হবার জো নাই।"

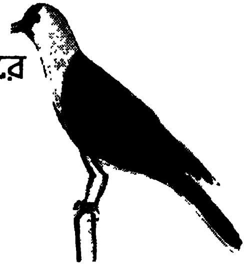
পরশুরাম: 'বিরিঞ্চিবাবা গল্প থেকে গৃহীত

সংকলক: **সনৎকুমার মিত্র**



কাক : মুসলিম সংস্কৃতি ও সংস্কারে

মুহম্মদ আবদুল জলিল



ইসলাম ধর্মের যারা অনুসারী তারাই মুসলিম বা মুসলমান।[১] মুসলমান কোন জাতিবাচক শব্দ নয়; ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষের নাম। জাতি-সত্তার মূলভিত্তি অভিন্ন সংস্কৃতি; অতঃপর ভাবা যেতে পারে ভাষার কথা। বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা জাতি, নানা ভাষাভাষীর লোক ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তারা মুসলমান হলেও একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী নয়। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ-কথা অনেক ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও কিছুটা সত্য। কিন্তু ইসলাম ধর্ম তার মূল পাঁচটি আদর্শ, যথা—নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত এবং ঈমান[২] ব্যতীত অপরাপর সকল আচার-অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কারকেই ধর্ম বহির্ভূত বলে মনে করে। উল্লেখ্য যে, ইসলামের উপর্যুক্ত পাঁচটি আদর্শই অনুসৃত হয় মূলত কোরআন এবং হাদীসের আলোকে। সারা বিশ্বের নানান জাতির মুসলিম সমাজে এতদসত্ত্বেও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার তাদের জাতিসত্তার সঙ্গে মিশে আছে।

মুসলিম সংস্কৃতি ও সংস্কার বলতে তাই সারা বিশ্বের নয়—শুধু বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। শুরুতেই বলেছি মুসলমান কোন জাতিবাচক শব্দ নয়—কিন্তু বাঙালি একটি জাতি আর বাঙালি মুসলমান সেই জাতিরই একটি অংশ বিশেষ। বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে ঐতিহাসিক কারণে অনেকটাই অভিন্ন সেই সত্য প্রতিপন্ন করার পূর্বে প্রথমেই বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের দিকটির প্রতি কিছুটা আলোকপাত করতে হয়।

বর্তমানে বঙ্গ-ভাষাভাষী-জন অধ্যুষিত উভয়বঙ্গের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে এই বঙ্গভূমিতে মুসলমান ছিল না বললেই চলে। অষ্টম-নবম শতাব্দী[৩] থেকে আরব দেশীয় বণিকদের চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন এবং তাদেরই কেউ কেউ চট্টগ্রামে অবস্থানের ফলে সামান্য কিছু মুসলমানের নিবাস চট্টগ্রাম এলাকার মধ্যেই গড়ে ওঠে এবং সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে সমগ্র বঙ্গের জনজীবনে ইসলাম ধর্মের আদৌ কোন প্রভাব

পড়েনি। বঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে, অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে [১২০৪ খ্রীস্টাব্দ]। অতঃপর মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছত্রছায়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের প্রচারণায় মুগ্ধ হয়ে এদেশের আত্মলুপ্ত বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের অগণিত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এছাড়া ইসলামের অত্যুৎশায়ী কিছু মুসলিম শাসকের নির্যাতনে এদেশের অনেক হিন্দু সধর্ম ত্যাগ কবতে বাধ্য হয়। তবে একথাও সত্য যে, শুধুই তলোয়ারের ভয়ে নয়, ইসলামের সুমহান আদর্শে মুগ্ধ হয়েও অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই ভাবে একদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপরদিকে শাসক, সৈনিক, কর্মচারী, রাজমিস্ত্রি, ধর্মপ্রচারক ভাগ্যান্বেষী অনেক বহির্ভারতীয় মুসলমানের এদেশে আগমন এবং বঙ্গের অনায়াসলব্ধ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে বসতি স্থাপন; এই দ্বিবিধ কারণেই ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ মাত্র তিন শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে নদীয়ায় শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব এবং তৎপ্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে হিন্দু ধর্ম অনিবার্য বিপর্যয় থেকে অনেকটাই রক্ষা পায়। কিন্তু তাই বলে যে, ধর্মান্তকরণের কাজ একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায় তা বলা যাবে না। কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামল থেকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অধিক নয়।

বিদেশী বিভাষী বিধর্মী মুসলিম শাসকেরা একটি সংখ্যালঘু ধর্ম সম্প্রদায় থেকে কি ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় উপনীত হয় তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর আছে। কারো মতে, দেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানের চেয়ে বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। খোন্দকার ফজলে রাবিব তাঁর 'বাংলার মুসলমান' গ্রন্থে মুসলিম শাসকদের বহিরাগত মুসলমানদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ এবং তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে লাখেরাজ সম্পত্তি দানের কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, দেশীয় মুসলমানের চেয়ে বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।[৫] তাঁর মতের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তিতে: 'ইসলাম কতকগুলো বন্য জাতি এবং হিন্দু নামধারী কতকগুলো অনার্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে. কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য সমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই।"[৬]

উল্লেখ্য যে, ফজলে বাবিব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতের সমর্থক খুব বেশি নেই। ইতিহাসে স্পষ্টত দেখা যায় বঙ্গে মুসলমান দু-শ্রেণীর: এক. বহিরাগত; দুই, দেশীয়। বহিরাগত মুসলমান আবার দু-শ্রেণীর: ক. উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণী এবং খ. নিম্নবিত্তের সাধারণ শ্রেণী। মুসলিম সমাজে এই আশরাফ-আতরাফ তথা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব ঘটে মূলত এদেশীয় বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের দেখাদেখি। হিন্দু সমাজে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা নিজেদের উচ্চবর্ণের এবং সমাজের অপরাপর শ্রেণীর মানুষকে শূদ্র বর্ণের তথা অস্পৃশ্য বলে মনে করে; মুসলিম সমাজের শাসন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠানেরা ও তেমনি নিজেদের আশরাফ শ্রেণীর বলে ভাবতে শেখে। বাঙলার উচ্চবিত্ত ও বর্ণের এই অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানেরাই বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি চিরদিন বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছে। কিন্তু বহিরাগত নিম্নবিত্তের মুসলমানেরা সুদীর্ঘ দিন এদেশের মুসলমানের সঙ্গে সহাবস্থান এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে দেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়ে। এরাই প্রকৃত পক্ষে বাঙালি সংস্কৃতির অনুসারী ও অনুকারী থেকে যায়। আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাঁর ভাষায়: 'এক কথায় এর উত্তর বোধ করি এভাবে দেয়া যায়: যাঁরা বাঙালি এবং একই সঙ্গে মুসলমান তাঁরাই বাঙালি মুসলমান'।[৬]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অধিকাংশ গবেষকের ধারণা বঙ্গে বহিরাগত মুসলমানের চেয়ে দেশীয় মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।[৭] এর প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশের মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস-সংস্কারে। ধর্মান্তরিত হলেও জাত্যান্তরিত হওয়া যে সহজ নয় বিগত কয়েক শতাব্দী বাঙলার সাহিত্যের-ইতিহাস তার প্রমাণ। ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতান লক্ষ্য করেন মুসলমানের ঘরে কোরআন হাদীসের পরিবর্তে রামায়ণ-মহাভারতের চর্চা অধিক। সৈয়দ সুলতান তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'নবীবংশ'-এ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন:

> "লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
> কবীন্দ্র 'ভারত কথা' কহিল বিচারি।
> হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
> খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে"।[৮]

অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন:

'কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উতপন
না বুঝে বঙ্গালী সবে আরবী বচন।
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল
[পশুর চরিত্র হই সে সব রহিল]
সদাএ পঠএ রাম-কৃষ্ণের যে কথা
শুনিয়া মোহর মনে লাগে অতি ব্যথা'।[৯]

মুসলিম সমাজে মূর্তিপূজা হিন্দুর আচার-সংস্কার যে, ষোড়শ শতাব্দীর পরেও ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হতো অষ্টাদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের আরেক কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর 'শরিয়ত নামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুদের দেখাদেখি মূর্তি তৈরি করতো, মহালক্ষ্মীর পুজো করতো, এবং মনসা ও চণ্ডীর উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগী বলি দিতো। এরূপ বলি দেওয়াকে ফাতেহা নাম দেওয়া হতো এবং এরূপ ফাতেহা দেওয়ার সময় মুসলমান মোল্লারা ব্রাহ্মণদের ন্যায় 'তৃণ' [পৈতা] বাঁধত'।[১০]

মুসলমান সমাজের এই ধর্মীয় অন্যতা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর চট্টগ্রাম এলাকার মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙলার অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে অনেকেই লৌকিক দেব-দেবীর পূজক ছিলেন।[১১] তারা নামাজ-রোজা ছেড়ে হিন্দু দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করতেন। মনসা, শীতলার ষষ্ঠী, সত্যপীরের পূজা দিতেন এবং কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ করতেন।[১২] বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান যে প্রায় অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি।

সংস্কারের জন্ম মূলত ভয় থেকে, ভীতি থেকে। 'কাক' সম্পর্কে বাঙলার হিন্দু-মুসলিম গণমানসে নানাবিধ সংস্কারের উদ্ভব প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই কথাটির উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়: 'ভয়-ভক্তি, ঘৃণা-ভালবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এই নিয়েই মানুষের প্রায় ষোল আনা মন। এতে সভ্য-অসভ্য, আদিম-আধুনিক কোন ভেদাভেদ নেই। তবে দুনিয়া যেমন বদলাচ্ছে আমাদের ভয়ের পাত্রও তেমনি বদলাচ্ছে। আদিম মানুষ যা যা ভয় করতো আধুনিক মানুষ হয়ত তার সবটাকে ভয় করে না। ভয়ের পাত্র বদলে গেছে ভয় কিন্তু রয়ে গেছে'।[১৩]

কাকের নানা ধরনের ডাক, নানা ক্ষণের ডাক; কাককে নানা অবস্থায় দর্শন নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে এদেশেব মানুষের হৃদয়ে নানা ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারের নীড় বেঁধে আছে। কাক নাকি দৈবজ্ঞ। কাকের ডাক থেকে নানা রূপ ভবিষ্যৎ গণনা করা হতো।

'জোতিষ রত্নাকার' এ আছে':

'ক্ক ক্ক কল্যাণলাভ
কঃ কঃ রাজোপদ্রব
করকং করকং বন্ধুজনের সাক্ষাৎ
কেতং কেতং রত্নহানি 'ইত্যাদি।'[১৪]

উল্লেখ্য যে, দাঁড় কাকের ডাককেই কিন্তু সকল কল্যাণ-অকল্যাণের দিক-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাবা দিনের কোন দণ্ডে কাকের ডাক কি ফলাফল বহন করে আনবে সে সম্পর্কে নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় পুঁথি-পত্রে, প্রবাদ-প্রবচনে যত্র-তত্র। এ-প্রসঙ্গে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হলো। যেমন:

"**এক.** উষার প্রথম দণ্ডে যদি 'অয় অয়' ধ্বনিতে কাক ডাকে তবে মহৎ সুখ্যাতি লাভ হয়।

দুই. দ্বিতীয় দণ্ডে অগ্নিকোণে যদি 'অয় অয়' ধ্বনি করে তবে শোক উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি উর্ধ্বমুখে ঐ ধ্বনি করে তাহলে সন্তান শোক ঘটে।

তিন. তৃতীয় দণ্ডে দক্ষিণ দিকে যদি 'মুয় মুয়' ধ্বনি করে তবে সেই দিবসে অকস্মাৎ ধন লাভ হয়।

চার. দিনের চতুর্থ দণ্ডে নৈঋত কোণে উর্ধ্বমুখে 'ময় ময়' রব করলে অগ্নিভয় এবং অধঃমুখে চৌর ভয় হয়।

পাঁচ. পশ্চিম দিকে পঞ্চম দণ্ডে যদি 'অহ অহ' রব করে তবে সেই দিবসে ধনলাভ হয়। উর্ধ্বমুখী ডাকলে দূর থেকে আর অধঃমুখে ডাকলে নিকট থেকে শীঘ্র ধন প্রাপ্তি হয়।

ছয়. পশ্চিম দিকে ষষ্ঠ দণ্ডে কাক যদি 'কাহা কাহা' রব করে তবে কার্যে লাভ ব্যক্ত করে।

সাত. বায়ুকোণে সপ্তম দণ্ডে কাক যদি 'আহে আহে' ধ্বনি করে তবে বাস্তুমধ্যে ব্যাধি যুক্ত হয়ে মারা যায়।

আট. অষ্টম দণ্ডে উত্তর দিকে 'যা যা' রব করলে অন্য দেশ থেকে সেই দিন কোন সংবাদ আসে।

নয়. নবম দণ্ডে ঈশান কোণে যদি 'হা হা' ধ্বনি করে তবে সেই দিন কেউ মারা যায় বা মৃত্যু সংবাদ আসে।

দশ. দশম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে মস্তকোপরি 'হা হা' রব করলে সেদিন পূর্ব প্রার্থনা সিদ্ধ হয়।

এগার. একাদশ দণ্ডে যার সম্মুখে 'আবা আবা' শব্দ করে তাঁর দৈবাৎ বিদেশ গমন ঘটে।

বার. কাক যদি দ্বাদশ দণ্ডমধ্যে অগ্নিকোণে ধ্বনি করে তবে সেদিন সে গৃহে পুত্র জন্ম হয়।

তের. ত্রয়োদশ দণ্ডমধ্যে 'জয় জয়' রবে বায়ুকোণে কাক ধ্বনি করলে সেদিন কোন শোকোৎপত্তি হয়।

চৌদ্দ. নৈঋত কোণে দিবা চতুর্দশ দণ্ডে 'কা কা' ধ্বনি করলে সেদিন অতিশয় ক্লেশ যুক্ত হয়।

পনর. দিনের পঞ্চদশ দণ্ডে উত্তর দিকে 'কোব কোব' শব্দ করলে হঠাৎ ঐ দিন বৈরীভয় উপস্থিত হয়।

ষোল. ষোড়শ দণ্ডে ঈশান কোণে যদি 'যা যা' ধ্বনি করে সেই দিবসে মহাদুঃখ উপস্থিত হয়।

সতের. সপ্তদশ দণ্ডে কাক যদি 'কোবা কোবা' রব করে তবে অকস্মাৎ সৎ বন্ধু লাভ ঘটে।

আঠার. অষ্টাদশ দণ্ডে দক্ষিণ দিকে 'আর আয়' রব করলে সকলের মহাদুঃখ ও ভয় উপস্থিত হয়।

উনিশ. ঊনবিংশ দণ্ডে অগ্নিকোণে যদি 'খাবা খাবা' রব করে তবে অকস্মাৎ উত্তম কর্ম লাভ ঘটে।

বিশ. বিংশ দণ্ডে যদি পশ্চিম দিকে 'মহ মহ' শব্দ করে গৃহস্বামীকে বিদেশ যেতে হয়।

একুশ. কাক যদি একবিংশ দণ্ডে 'জয় জয়' শব্দ করে তবে সেই দিন অর্থলাভ ঘটে।

বাইশ. দ্বাবিংশ দণ্ডে ঊর্ধ্বস্থিত হয়ে কাক যদি 'না না' ধ্বনি করে তবে সেই দিবসে গৃহস্বামীর ভূমি লাভ হয়।

তেইশ. পূর্ব পার্শ্বে ত্রয়োবিংশ দণ্ডে 'আকা আকা' শব্দ করলে সেই ব্যক্তির সেই দিনে বাস্তুলাভ হয়।

চব্বিশ. কাক যদি চতুর্বিংশ দণ্ডে 'অম্বয় অম্বয়' শব্দ করে তবে সেই দিবসে ঐশ্বর্য লাভ হয়।

পঁচিশ. কাক পঞ্চবিংশ দণ্ডে দক্ষিণ দিকে 'ওয়া ওয়া' শব্দ করলে অকস্মাৎ চক্রান্তের অপরাধে পড়তে হয়।

ছাব্বিশ. কাক ষষ্ঠবিংশ দণ্ডে 'খায়ে খায়ে' শব্দ করলে সেই গৃহের কেহ সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে।

সাতাশ. সপ্তবিংশ দণ্ডে পশ্চিম দিকে 'আহা আহা' শব্দ করলে গৃহস্থের সেই দিন সর্বক্ষেত্রে শুভ হয়।

আঠাশ. কাক উত্তর দিকে অষ্টবিংশ দণ্ডে 'আকা আকা' রব যে ব্যক্তির বাড়িতে করে সেই ব্যক্তি সুখী হয়।

উনত্রিশ. ঈশান কোণে উনত্রিশ দণ্ডে যদি কাক 'সা সা' শব্দ করে তবে তার বাসনা সিদ্ধ হয়।

ত্রিশ. উর্ধ্বদিকে কারো বাড়িতে ত্রিশ দণ্ডে কাক 'আখা আখা' রব করলে সেই দিনটি তার সুখেই কাটে।

একত্রিশ. একত্রিশ দণ্ডে ভূমিতে বসে 'আবা আবা' রবে কাক ডাকলে সেই দিন দুঃখে অতিবাহিত হয়"।[১৫]

কাক সম্পর্কিত এ-ধরনের সংস্কার শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই নয়; মুসলিম সমাজের নর-নারীর হৃদয়কেও আন্দোলিত করে।

কাককে নিয়ে মুসলিম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সুদূর অতীত কাল থেকে নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার দানা বেঁধে আছে তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগের মুসলিম কবিগণ রচিত সাহিত্যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনে এবং মুসলিম মরমী সাধকদের সাধন সঙ্গীতে। আমরা ঐ-সব উপকরণ থেকে এখানে কিছু উদাহরণ উপস্থিত করবো:

সাহিত্য :

মুসলিম সমাজে মৃতদেহ সম্পর্কিত ধর্মীয় প্রথায় অর্থাৎ মুসলমানের মৃতদেহকে কবরস্থ করার ক্ষেত্রে প্রথম দিব্য দৃষ্টি দান করে কাক।

ইসলামী শাস্ত্র মতে আদি মানব আদম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়ার অসংখ্য সন্তানের মধ্যে হাবিল-কাবিল নামক দুই ভ্রাতা তাদের এক ভগ্নিকে বিবাহ করা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়। সংঘাতে কাবিলের হাতে হাবিলের মৃত্যু ঘটে। ভ্রাতৃ হত্যার জন্য কাবিল একদিকে যেমন অনুশোচনায়

কাতর অপরদিকে হাবিলের দেহ কিভাবে কোথায় লুকিয়ে রাখবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার ভয়ে কাবিল যখন এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই সময় স্বয়ং স্রষ্টা তার সহায়তায় এগিয়ে আসে। কিভাবে হাবিলের দেহ কবরস্থ করতে হবে তা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য নিরঞ্জন বা স্রষ্টা স্বর্গের দুই ফেরেস্তাকে কাকের বেশে মর্তে প্রেরণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর[১৬] কবি সৈয়াদ সুলতান তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'নবীবংশ'-এ কাক চরিত্রের এই মুখ্য ভূমিকা পালনের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন :

'প্রভু নিরঞ্জনে দুই ফিরিস্তা পাঠাইলা।
গোর খুদি কুমারক রাখিতে বুলিল।।
তবে দূতে কায়া ধরি হৈলা দুই কাক।
অন্যে অন্যে ধাওয়াইয়া লইলেক লাগ।।
স্বর্গ হন্তে সেই কাক আসিয়া মিলিল।
একেক ধরিয়া আনে
মারিতে লাগিল।।
চঞ্চুএ চঞ্চুএ কটাকট আছিল বহুল।
একেক ধরিয়া আনে করিল নির্মূল।।
বায়সে বায়স ধরি করিলা নিধন।
দুই মধ্যে এক কঙ্ক তেজিলা জীবন।।
এক কাকে আর কাক হরিল জীবন।।
চঞ্চুএ চঞ্চুএ গাড়া খুন্দি করিল গহন।
ঠোঁটে ধরি কাকে কাক
গাতেত পেলিল।
উত্তর শিয়রে করি মাটি ঝাঁপাইল।।
কাকে কাক মারে যদি লুকাই রাখিল।
দেখিয়া কাবিল মনে উপাএ জন্মিল।।
সেইরূপে কাবিলে করিল এক গাত।
হাবিল কুমার নিয়া রাখিল তথাত।।
উত্তর শিয়রি করি হাবিল রাখিল।
কাবিলে তাহার পরে মাটি ঝাঁপাইল।।
হাবিলক যদি সে কাবিলে মাটি দিল।
সেই আদ্য আচার সে জগতে রহিল'।।[১৭]

কবি বর্ণিত মুসলিম সমাজের এই আদিম প্রথা সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত আছে কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও বঙ্গের মুসলিম সমাজে এই প্রথা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে।

সৈয়দ সুলতান তাঁর 'জ্ঞানপ্রদীপ' নামক অপব একখানি কাব্যগ্রন্থে কাকের কথা এনেছেন সূফী-তাত্ত্বিক সাধনার নানা দিক বর্ণনা প্রসঙ্গে; যাকে তাঁর ভাষায় বলা হয়েছে 'কাকি-কর্ম'। কিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় মূলত দেহতাত্ত্বিক এই সাধনার মর্মবাণী অভিব্যক্ত হয়েছে এই ভাষায়:

'অখনে কহিব শুন কাকি নাম কর্ম
সাবধান হই শুন তাহার যে ধর্ম।
দুই ওষ্ঠ কাকমুখ আকার কবিব
বন্ধ পুরিয়া বাউ উদর ভরিব'।[১৮]

সৈয়দ সুলতান যেমন দূত হিসেবে উপস্থাপন করে কবর প্রথা প্রচলনের ক্ষেত্রে কাক চরিত্রে অসাধাবণ গৌরব দান করেছেন তেমনি আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের[১৯] কবি মুহম্মদ কালা তাঁর 'নিযাম পাগলা' শীর্ষক পালায় কাককে পণ্ডিত জন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাক যে মঙ্গলের প্রতীক ভবিষ্য-জ্ঞানী কবি কাব্যের নায়িকা কমলবতীর বিরহ বর্ণনার পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কবির ভাষায়:

'নিজামের শোগে আমার তনু জর জর।
কহিব মনের দুক্ষ কাহার গোচর॥
ভাঙ্গিব হস্তে কঙ্কন ছিড়িব গলার হার।
য়ভাগিনির লক্ষ্য নাহি সংসার মাঝার॥
নাকের বেসর খুলি জুগুনি হইব।
দেহের মাংস কাটি কাগাকে খোআব॥...
জত অলাখার আদি সব বিলাবে।
ফিরিব জুগুনি হএআ গলে কেথা দিআ।
জবোতো নিজাম আমার না আইসে ফিরিআ।
সম্মুখে আসিয়া কাগা কাহা কাহা করে।
আকুল হইল কন্যা দেখিআ তাহারে॥...
কন্যা বলে শুন কাগা তুমি পণ্ডিত জন

মিষ্ট অন্য খাইতে দিব এ থাল ভরিয়া
ঠোট আর পাখা তোর বান্ধিব সোবোন্যো জড়িয়া।...
তোমার বাক্ষে নিজামক জদি দেখি
আগা বাড়াভ কাগ সুন কহি অভাগিনি
আজি আমি গলার হার তোকে দিব আনি'।[২০]

অষ্টাদশ শতাব্দীর[২১] কবি করমুল্লাহও তাঁর 'মৃগাবতী' কাব্যে কাককে নায়িকার দূত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নায়িকা মৃগাবতী নায়ক জামিনীভানের বিবহে ব্যাকুল। তার চোখে নিদ্রা নেই; দিবারাত্র শুধু জামিনীভানেব জন্য ধ্যান-মগ্ন। মৃগাবতীব যখন এমনই মানসিক অবস্থা তখন প্রাতে ঘুম থেকে উঠেই প্রাচীবের উপর কাককে উপবিষ্ট দেখে [সে ব্যাকুল] হয়ে ওঠে। তাঁর প্রেমিকের কাছে তার বিবহ বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়াব জন্য মৃগাবতী কাকেব কাছে সবিনয় অনুবোধ জানায়। কবিব বর্ণনাটি অতি উপভোগ্য। তাই এখানে উদ্ধৃত করাব লোভ সংববণ করতে পারলাম না :

'প্রভাতে উঠিয়া বালা নেকালি বাহিরে।
দেখিল বায়স এক প্রাচীর উপরে॥
প্রাচীরে বসিয়া নাথ করে কোলাকল।
শুনিয়া বিশেষ বালা হইলা বিকল॥
তখনে বায়স প্রতি বলিল ডাকিয়া।
মোর দুঃখ বৃত্তান্ত লই যাও যথা প্রিয়া॥
কহিয়া তাহান পদে পরম ভক্তি।
সেইপদ বিনে মোর আন নাহি গতি॥
তাকি বিনে চন্দ্র বক্র হইছে মলিন।
অভ্রে আচ্ছাদিল জেন আর্ক প্রভাহীন॥
মোর গতি মতে তুমি দেহ নয়ানে।
বিস্তারি কহিও দুঃখ তাহান চরণে॥
যদি প্রাণ নাথ বাণী পার আনি দিতে।
প্রভূ স্মরি সত্য কইলুম তাহার সহিতে॥
যুগ চঞ্চু মুড়াইমু নির্মল কাঞ্চনে।
দুই পদ অষ্ট নোখ জড়িমু রতনে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতননী খিরিসা সাক্কর।

রস অঙ্গে মিষ্ট অন্ন দিমু ভক্ষিবার॥
এতেক কহিতে কাক চলিল উড়িয়া।
কুমারি রহিল মনে সান্তাপিত হৈআ'॥[২২]

যাত্রাপথে কাকের ডাক অমঙ্গলসূচক এই সংস্কার শুধু সাধারণ মানুষের মনে নয় মধ্যযুগের অনেক মুসলমান কবিরও মনে এধরনের সংস্কার ছিল দৃঢ় মূল। অষ্টাদশ শতাব্দীর[২৩] কবি বুরহানুউল্লাহ তাঁর 'নবীনামা' গ্রন্থের নায়ক ফলঙ্গ রাজার যুদ্ধে যাত্রাকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কাক'-দর্শন যে অমঙ্গলসূচক সে ধারণা ব্যক্ত করেছেন :

'ডাহিনে শৃগাল দেখে বামেত শগুনি।
পঞ্চম সাট দিয়া তবে উড়িল গিধিনী॥
শুকান ডালে পড়িয়া ঘন ডাকে কাও।
হগুনি মাটিয়া আনে অদ্যখানি নাও॥
বিধবার ছাইলা ধেনু চরাইতে যায়।
পথে রয়া ডাকে মায় ফিরি ঘরে আয়'॥[২৪]

প্রবাদ-প্রবচনে :

মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক প্রবাদ-প্রবচনেও কাককে নিয়ে শুভাশুভ নানা সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। যেমন:

'দিবা শিবা নিশীথে কাক
বৎস সম্মুখে গভীর ডাক
যে গ্রামে গৃধিনীর বাস
ছাড়বে ভাই সে গ্রামের আশ'।[২৫]

অর্থাৎ যে গ্রামে দিনের বেলা শিয়াল রাতে কাক ও বাছুরের সামনে গাভি ডাকে এবং শকুনি বাস করে সেই গ্রামে অমঙ্গল ঘটে। অতএব সে গ্রাম ত্যাগ কর।

এছাড়া কাক চরিত্রের ধূর্ততা শঠতা এবং দ্রুত পলায়নপরতা সম্পর্কেও নানা ধরনের প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায় মুসলিম সমাজে। যেমন :

এক. 'গাছে বসে কাগে হাগে—বলে কেউ দেখেনি'। অর্থাৎ, কারো দুষ্কর্মের কথা জানাজানি হলেও যদি অপরাধী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চায় তবে প্রতিবাদে এরূপ কথা বলা হয়।[২৬]

দুই. কাউয়ার বাসায় কুলির ছাও
জাত বুঝিয়া করে রাও।

অর্থাৎ, যে কোন পরিবেশে গেলেও স্বভাবদত্ত গুণ বা দোষ পরিত্যাগ করা যায় না। স্বভাব মূলত অপরিবর্তনীয়।[২৭]

তিন. কাকের ডিমও সাদা হয়
পণ্ডিতের পুতও গাধা হয়।

অর্থাৎ, ঘটনা চক্রে কোন বিদ্বানের পুত্র মূর্খ হলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য হয়।[২৮]

উল্লেখ্য যে বাঙলার মুসলিম সমাজে কাক সম্পর্কিত এমনি আরো অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন রয়েছে।

লোকসঙ্গীতে :

লোকসঙ্গীত প্রকৃত পক্ষে লোক-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। যাত্রাপথে শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাক দেখা যে অমঙ্গলসূচক এই সংস্কার মুসলিম মরমী সাধক মহিন শাহ পরিবেশিত একটি সঙ্গীতে উল্লেখিত হয়েছে। সঙ্গীতটি এইরূপ :

'দিন থাকিতে দিনের ভজন
করলিনেরে মন,
তোর সুদিন গেল কুদিন এলো
কোন দশা ঘটে কখন,
দিন দুপুরে দিনের দাবি
দিন ফুরালে দিন কি পাবি
জল শুকালে কি ফল খাবি
শুষ্ক তখন
কালের গাছে জল দিলে না
অকালে তো ফুল মিলে না
শুষ্ক ডালে ডাকিছে কাক
হবে না অভাব মোচন
আগুনে হয় আগের খবর
সময়েতে সয়না সবুর
মঙ্গল শাঁই কয় সময়ে ধর
মহিন অভাজন'।[২৯]

মরমী কবি পাঞ্জশাহ তাঁর একটি সঙ্গীতে কাক প্রসঙ্গে বলেছেন :

'কাকা তোতা এক খাঁচাতে
যত্ন করে পোষ মানাতে

বুলি ধরাইব বলে খেতে দেয় মাখন ছানা।
তোতা বুলি ধরে নিবে কাকের বুলি হবে না'।[৩৩]

কাক দেখতে কদর্য, কাকের কণ্ঠস্বর কর্কশ, তবুও কাক স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে বাঙালির বিশ্বাস-সংস্কারের মণিকোঠায়; আপামর বাঙালি মুসলমানের মানস-ভাবনায়।

---

১. Dr. Shaikh Ghulam Magsud Hilali· *Perso Arabic Elements in Bengali [Dhaka, 1967] p.237.*

২. মুহম্মদ আবদুল জলিল: 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ', [ঢাকা, ১৯৭৬] পৃ. ১৮১।

৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: 'পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম' [ঢাকা ১৯৪৮] পৃ: ১৭। ড. আবদুল করিম: 'চট্টগ্রামে ইসলাম,' [ঢাকা, ১৯৭০] পৃ. ১৭।

৩. অসমসাহসী ভাগ্যান্বেষী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এর ফলে ঐ তারিখগুলি ১২০০ থেকে ১২০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। তবে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ইতিহাসে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, 'বখতিয়ার ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন'।

৪. খন্দকার ফজলে রাব্বি: *The Origin of the Musalmans of Bengal* ['বাঙলার মুসলমান'— অনুবাদক মুহ.আবদুর রাজ্জাক: ঢাকা ১৯৬৮]: পৃ. ৭.।

৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'হিন্দু ধর্ম', বঙ্কিম রচনাবলী, [মৌসুমী প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৮৩] পৃ. ৭৫৬।

৬. আহম্মদ ছফা: 'বাঙালী মুসলমানের মন': [ঢাকা, ১৯৮১] পৃ. ১৯।

৭. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবপন্ন মুসলমান কবি': [কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ] পৃ. ১।

৮. সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ [১ম খণ্ড] আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৮, ভূমিকা পৃ. ৯।

৯. —ঐ : [২য় খণ্ড] পৃ. ৪৭৯।

১০. নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত শরীয়তনামা, আবদুল করিম সম্পাদিত। 'বাংলা সাহিত্য সমিতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫ ভূমিকা পৃ. ৪৬।

১১. কাজী আবদুল ওদুদ: 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ,' বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫।

১২. ইসলাম প্রচারক ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ পৃ. ৯৯।

১৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: 'লোকসংস্কার', সাহিত্যিকী, ১ম বর্ষ, শরৎ সংখ্যা ১৩৬৬, পৃ. ২৪১।

১৪. তদেব।

১৫. ঢাকা থেকে প্রকাশিত লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৩৯২ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৬—১০৮।

১৬. আহমদ শরীফ: সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৫৪।

১৭. সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ [১ম খণ্ড], পৃ: ১২৭—২৮।

১৮. —ঐ : [২য় খণ্ড], পৃ. ৬৩৭।

১৯. মুহম্মদ আবুতালিব: পঞ্চদশ শতকের কবি [শ্রী মুহম্মদ কালা ও তাঁর কাব্য], লেখক সংঘ পত্রিকা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ১২।

২০. —ঐ : পৃ. ১৭—১৮

২১. কবমুল্লা বিরচিত 'মৃগাবতী': মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, ভূমিকা পৃ. ১৫।

২২. —ঐ : পৃ. ১০৫—৬।

২৩. মুহম্মদ আবুতালিব: 'বাংলা কাব্যে ইসলামী রেনেসাঁ' ইসলামিক ফাউণ্ডেশান, বাংলাদেশ ১৯৮৪, পৃ: ২৪৬।

২৪. —ঐ : পৃ: ২৬৮।

২৫. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান সংকলিত বাংলা প্রবাদ পরিচিতি: ২ খণ্ড: ২য় পর্ব, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ১১৮।

২৬. —ঐ : পৃ: ২০।

২৭. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত, মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সংকলিত, লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯ পৃ. ১২৪।

২৮. —ঐ : ঐ, পৃ. ১২৪।

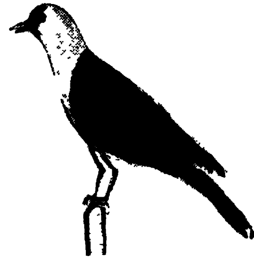
২৯. ফকির মহিনশাহ, পিতা গুরু মঙ্গল শাঁই দরবেশ, গ্রাম হারুতরিয়া নতুন পাড়া, পো: পাটিকা বাড়ি, কুষ্টিয়া [বাংলা একাডেমীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]।

৩০. ড: খোন্দকার রিয়াজুল হক: মরমী কবি পাঞ্জশাহ জীবন ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ: ৫১৮।

□

কাক : কাকতাড়ুয়া

নির্মলেন্দু ভৌমিক



১.

ভারতীয় সামাজিক ও কৃষিজীবন, দর্শনতত্ত্ব এবং অন্যান্য দিকের সঙ্গে কাক গভীরভাবে জড়িত। কেবল ভারতীয় জীবনই নয়, এক অর্থে গোটা বিশ্বের মানুষের কাছেই এই পাখিটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এর মূল কারণ, কাক মূলত সামাজিক প্রাণী, অরণ্যচারী নয়। প্রতিদিনের সামাজিক জীবনের সঙ্গে এ পাখি জড়িয়ে আছে। কাকের মধ্যে অবশ্য শ্রেণীভেদ আছে: পাতিকাক এবং দাঁড়কাক (Jack daw)। পাতিকাকের ঘাড় সাদাটে, দেখতেও দাঁড়কাকের তুলনায় ছোটো। দাঁড়কাকের গলার স্বর ভাঙা, দেখতে একটু ভারি, সংখ্যাতেও অল্প। সাধারণভাবে অবশ্য কাক বলতে এই দু-ধরনের কাকই। দাঁড়কাককে কোথাও কোথাও 'ডোম কাক' বলা হয়।

মানুষের সঙ্গে কাকের এই সাহচর্যই কাক সম্পর্কে নানা সংস্কার-বিশ্বাসকে গড়ে তুলেছে। এই সব সংস্কার-বিশ্বাসের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে যে তত্ত্বটি মেলে, তা হল—এই পাখি সম্পর্কে বিপরীত বিশ্বাস। পাখিটি একই সঙ্গে শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গলকারী পাখিতে পরিণত হয়েছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে কখনো তাই মিলেছে অশ্রদ্ধার বোধ। কখনো এই বাস্তব ও সত্য পাখি থেকে এসেছে কোনো কাল্পনিক ও সাহিত্যিক পাখির অস্তিত্বের কল্পনা। যেমন, কালো রঙের হাতির বদলে 'শ্বেতহস্তী'র কল্পনা এসে গেছে আলঙ্কারিক অর্থে (White elephant), যেমনি কাকের বেলাতেও। অবশ্য এইখানে বলা প্রয়োজন—ব্রহ্ম [বর্তমানে 'মায়নামার'], শ্যাম প্রভৃতি দেশে সত্যিই একদা শ্বেতহস্তীর অস্তিত্ব ছিল,—কিন্তু ইংরেজিতে 'White elephant' একটি আলঙ্কারিক অর্থে [=মূল্যের তুলনায় যে বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেশি] যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তার সঙ্গে বাস্তবের শ্বেতহস্তীর কোনো যোগ থাকে না। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যে 'শ্বেতকাউয়া' এমনি ধরনের এক পাখি। এই 'শ্বেত কাউয়া' মানুষের সাহায্যকারী এক শুভঙ্কর পাখি।

প্রাচীন ভারতে বা প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও পাখি সম্পর্কে নানা বিপরীত ও বিরুদ্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্যেন-বাজ-ঈগল-প্যাঁচা প্রভৃতি পাখি সম্পর্কে এই ধবনের বিরুদ্ধ-বিশ্বাস দেখা যায়। এক যুগে এক দেশে যে পাখি কল্যাণকাবী, পববর্তী যুগে সেই দেশেই হয়তো সেই একই পাখি সম্পর্কে বিপরীত বিরুদ্ধ ধাবণাব সৃষ্টি হল। এই বিরুদ্ধ-বিপরীত ধারণার মধ্যে সেই দেশেব সাংস্কৃতিক ধারা ও বিবর্তনের ইতিহাস ধবা পড়ে। যেমন, যিশু খ্রীস্টকে অবলম্বন কবে যে Christ-lore-এব উদ্ভব হয়, তার ফলে Robin red-breast এবং চড়ুই পাখি সম্পর্কে ক্যাথলিকদের মধ্যে বিশিষ্ট বিশ্বাসেব সৃষ্টি হয়। আহত যিশুব ক্ষতস্থান আপন বুক দিয়ে মুছে দিয়েছিল বলেই আজও রবিন পাখিব বুকটা লাল হয়ে আছে; কিন্তু চড়ুই যিশুকে সমবেদনা জানানো দূরে থাক, সে উল্লাস অনুভব কবেছিল বলেই খ্রীস্টানদের কাছে সে ঘৃণা-অশ্রদ্ধাব পাখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো কর্তব্যচ্যুতি কিংবা কোনো নৈতিক বা যৌন অপবাধের কারণে কোনো বিশেষ পাখি সম্পর্কে কোনো জাতির সংস্কৃতিতে এই ধবনের বিপরীত ও বিরুদ্ধ সংস্কারের জন্ম হয়। প্যাঁচা ছিল রাজকন্যা ['হ্যামলেট' নাটকে শেক্সপীয়র এব পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন], কিন্তু, এক অকথ্য যৌন অপবাধের কারণে তার সম্পর্কে ধাবণার বিরুদ্ধতা ঘটে। ভাবতীয় সংস্কৃতিতেও প্যাঁচা সম্পর্কে বিরুদ্ধ ধারণার অস্তিত্ব দেখা যায়। বেদের কাল থেকেই তা দেখা যায়। এখন সাদা প্যাঁচাকে [যাকে ইংরেজিতে বলে 'Barn-Owl'] 'লক্ষ্মী প্যাঁচা' নাম দিয়ে প্যাঁচাকে অবক্ষয় থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা দেখা যায়। 'Barn' কথাটির অর্থ হল—'গোলাবাড়ি', যেখানে ধান ইত্যাদি রাখা হয়। সুতরাং একে 'লক্ষ্মী প্যাঁচা' নাম দেওয়া খুব সঙ্গত হয়েছে। কাক সম্পর্কেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে।

২.

বৈদিক-পৌরাণিক সাহিত্যে কাকের যে শ্রদ্ধেয় আসন ছিল, কালক্রমে তা অবক্ষয়িত হয়ে পড়ে। পৌরাণিক বা ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য থেকেই এই অবক্ষয়ের সূচনা। প্রাচীন ভারতের নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রার কালে সঙ্গে কাক নিত, একটি বৌদ্ধ জাতকে তার সুস্পষ্ট উল্লেখও মেলে। এই কাককে বলা হত 'দিশাকাক'। সমুদ্রে নাবিকেরা পথ ও দিক-দিশা হারিয়ে ফেললে, সঙ্গের সেই কাককে তারা উড়িয়ে দিত। কারণ, কোন্ দিকে স্থল বা ডাঙা আছে, কাক তার প্রতিভা-ক্ষমতার ফলে সেই দিকপানে উড়ে যেত,—নাবিকেরাও 'দিশা' পেত। মহাপ্লাবনের পর নোয়াও দিশা হারিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ছাড়লেন ঘুঘুকে।

সে ছোটো একটি ডাল মুখে নিয়ে ফিরে এল। অর্থাৎ তখন মহাপ্লাবনের পর ডাঙা জেগে উঠতে শুরু করেছে। তারপর তিনি [হয়তো বা প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস অনুসারে] পাঠালেন কাককে। কিন্তু কাক ফিরে আসে নি। কাক সম্পর্কে যে ক্ষমতা-প্রতিভার বিশ্বাস ছিল, নোয়া সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাককে পাঠিয়েছিলেন [যদিও প্রথমে পাঠান ঘুঘুকে], কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন, খাদ্যরূপে প্রচুর মৃতদেহ দেখে কাক তার কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল, সে জন্যেই সে আর ফিবে আসে নি। কাকের প্রসঙ্গে বিরূপতাই এই ধরনের ব্যাখ্যা-মন্তব্যের মূল কারণ।

রামায়ণে কাকের সম্পর্কে দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। কাককে যখন 'ভুশণ্ডী' বলা হয় তখন সে কাক ত্রিকালদর্শী কাক। ভুশণ্ডীর কাক নাকি আজও বেঁচে আছে। মধ্য ভারতের গোঁড়দের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীতে কাক একজন নায়ক—পৌরাণিক সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত ক্ষেত্রেও কাককে সৃষ্টিকর্তার সম্মান দেওয়া হয়েছে। অথচ, পৌরাণিক সাহিত্য রামায়ণেই দেখা যায় [লোকবিশ্বাস অনুসারে] কাক শ্রীফল মনে করে সীতার বক্ষদেশ ঠুকরে দিয়েছিল এবং সীতারই অভিশাপে কাক বাঁকা চোখে তাকায়, অর্থাৎ সে কানার মতো একদিকে ঘাড় হেলিয়ে তাকায়। রামের তুলনায় রাবণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনেক বেশি অশ্রদ্ধেয়। একদা যম রাবণের ভয়ে কাকরূপ ধাবণ করেন। পূর্ববঙ্গে কাককে পীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, 'কাউয়াপীর' নামে কাক-দেবতার উদ্দেশে খাদ্যাদি নিবেদিত হয়ে থাকে। কাক বালক-বালিকার প্রার্থনায় সদয় হয়ে গাছ থেকে পাকা কুল ফেলে দেয়, বালক-বালিকারা তা আহরণ করে। তারা ছড়া বলে: 'কাগা আমার ঠাকু-ভাই [ঠাকুর ভাই] / বরই [কুল] ফেলা বাড়িত্ যাই।' পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাতেও এই ছড়াটি প্রচলিত আছে। ছড়াটির নানা কথান্তরও মেলে। সব কটিতেই কাকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। মালদহের মুসলমান বালকেরা ছড়া কাটে: 'কাউয়া নানা, এক আম দেনা।' দৌত্যকর্ম সম্পর্কে কাকের প্রতিভা চিরদিন স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কারো মুখের সম্মুখে এসে কাক ডাকলে বাড়িতে অতিথি আসবে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে কাকের এই দৌত্য খুব প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহিতা নারী তার শ্বশুরালয়ের যাবতীয় দুঃখবেদনা কাকের মুখে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেছে। সধবা নারীকে অনেক ক্ষেত্রে তা কাককে বলতে হয় নি—কাকই যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, আপন সহৃদয়তা দিয়ে কারোর দুঃখব্যথা তার পিতা-মাতাকে জানিয়েছে।

অথচ, এই কাককেই আবার নানা কলঙ্কের ডালি বহন করতে হয়েছে। বিভিন্ন লোককথায় কাকের পরাজয়-পরাভব এবং মৃত্যুর কথা কল্পিত হয়েছে। কাকের কালো রঙের সঙ্গে তার আগুনে পুড়ে মরণের কথাও মেলে। পূর্ববঙ্গের আশ্বিন সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠেয় গাসীব্রতের একটি 'কথা'য় দেখা যায়,— অলক্ষ্মী দাঁড়কাকের রূপ ধারণ করেছেন। চড়ুইয়ের মতো এক ছোটো পাখির কাছে কিংবা টুনটুনির কাছে কাক হেরে গেছে। যেমন কাকের মৃত্যু কল্পিত হয়েছে, তেমনি মরণের সঙ্গেও কাক যুক্ত হয়ে গেছে। প্রবাদ পাই: 'বাঘের আগে কেউয়া / যমের আগে কাউয়া।' বিভিন্ন প্রবাদ-ছড়া-লোককথায় কাকেব পরাজয়-পরাভব-মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছে। এই দিকগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল — কাকের মৃত্যু। দাঁড়কাক সম্পর্কে ভারতীয় লোকমানস কোনোদিনই উচ্চধারণা পোষণ করে নি। 'ধাটকাউয়া', 'ধারকাউয়া', 'ডোমকাক' ইত্যাদি প্রতিশব্দে সে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মনে হয় দাঁড়কাকের কর্কশ, ভাঙা ভাঙা স্বর, সর্বাঙ্গের কালো রঙ কোনো এক সময়ে পাতিকাকের ওপর গিয়ে বর্তায়। যাই হোক সাধারণভাবে কাকের এই দুই বিপরীত বিশেষত্ব [শুভ/অশুভ সত্তা। প্রীতিপ্রদ/ভীতিপ্রদ দিক] লোকমানসকে অপর এক দিকে টেনে নিয়ে গেছে॥

৩.

প্রবাদ আছে, 'কাকের মাংস কাক খায় না'। এর মধ্যেও কাকের মরণের প্রসঙ্গ আছে। যেমন, এক মৃত কাকের মাংস অপর জীবিত কাক খায় না, তেমনি এক মৃত কাকের পালক দেখলে জীবিত কাক ভয় পায়। বহু অঞ্চলে সে জন্যে কাক তাড়াবার জন্যে মৃত কাকের পালক ঝুলিয়ে রাখা হয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ত্রিপুরার মালোগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই রীতির অনুসরণের কথা লিখেছেন। এখন যাকে আমরা 'Scare Crow' অর্থাৎ কাককে ভয় দেখিয়ে দূরে তাড়ানোর একটি উপায় বলে মনে করি, তা হল একটি কিম্ভূতকিমাকার Anthropomorphic রূপ; কিন্তু আমার অনুমান, আদিতে এই কাকতাড়ুয়া মূলত ছিল — মৃত কাকের পাখা-পালক; পরে নরাকৃতির আভাসযুক্ত কোনো কিম্ভূত মূর্তির প্রচলন প্রবর্তন ঘটে।

আশ্চর্যের কথা এই, 'Scare Crow'-এর যে কিম্ভূত কিন্তু নরাকার মূর্তির প্রবর্তন দেখা যায়, তার মধ্যে কাকের ওপরে উল্লিখিত দুই বিপরীত দিকই স্বীকৃত। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে Scare Crow-কে বলে — 'নজর কাটা'। অর্থাৎ অপরের evil eye বা কুনজরের দোষ কাটায় যে নরাকার কিম্ভূত মূর্তি।

এর মধ্যে তখন একটি Mana-র অধিষ্ঠান কল্পিত হয়, যে Mana-র উৎস সুপ্ত আছে কাকেব নানা গুণ-শক্তি-ক্ষমতার মধ্যে। ট্রাকে-লরিতে যেমন শিবের ত্রিশূল-সাপ-ডম্বরু Mana রূপে ব্যবহৃত হয়, কিংবা দুর্ঘটনা প্রতিরোধী শক্তি রূপে সজাগ দৃষ্টির প্রতীক স্বরূপ ট্রাক লরির দুপাশে আঁকা থাকে যে এক জোড়া চোখ 'নজর-কাটা' হল তাই। নতুন ঘর-বাড়ি তৈরির সময় যে স্থানে ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেইখানে একটি লম্বা বাঁশ বা খুঁটিতে ছেঁড়া-জুতো, ভাঙা ঝুড়ি, মুড়ো ঝাঁটা ঐ একই কারণে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিরোধী শক্তিরূপে ছেঁড়া জুতো এখনো ট্রাক-লবিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, কখনো বা এক জোড়া নাগরাই জুতো এঁকেও দেওয়া হয়। এই একই উদ্দেশ্যে পাকা লেবু, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতি ঝাঁঝালো ও ক্ষারদ্রব্য এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে ঝোলানো হয় দোকানের সামনে।

মৃত কাকের পাখা-পালক থেকে নরাকার কিম্ভূত মূর্তিব প্রয়োগ-প্রচলনের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইঙ্গিতও আছে। অপর দিকে তেমনি কাক সম্পর্কে দুই বিপরীত-বিরুদ্ধ ধারণার দিকটিও আছে। কাক যখন ক্ষেতের ফল-ফসলের ক্ষতিকারক পাখি, তখন সে অবাঞ্ছিত একটি প্রাণী,—তখন তাকে বিতাড়ন করাটাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তখন কাকের ক্ষতিকারক ও অশুভ শক্তির দিকটিই প্রধান। কিন্তু, এই কাকই যখন ঈর্ষাকাতর কোনো ব্যক্তির কুনজরে-পড়া ক্ষেতের রক্ষাকারী হয়ে ওঠে, তখন তার শুভশক্তির দিকটিই মানুষের লক্ষ্য হয়। আগেই বলেছি, কাকের বাস্তব পাখা-পালকই ছিল মূল 'কাকতাড়ুয়া', নরাকৃতির আভাসময় কিম্ভূতমূর্তি, যা দর্শনমাত্রই দর্শকেব [এবং পাখিদের] মনে এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া রচনা করে,—তখন বাস্তবতার অপর দিক প্রতিফলিত হয়। বাস্তবতার তাহলে দুটি মাত্রা আছে: প্রথমত, বাস্তবিকই কাকের পালকের ব্যবহার; দ্বিতীয়ত, নরাকৃতির কিম্ভূতকিমাকার ভয়সঞ্চারী এক বাস্তব দিক।

লোকজীবন ও মানসে প্রতীক-সঙ্কেতের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে প্রতীক-সঙ্কেত অবশ্য নানা মাত্রার, নানা ধরনের। এই প্রতীক-সঙ্কেত রচনার মধ্যে আবার বহু ক্ষেত্রেই থাকে অন্য কোনো দিক বা উপকরণ,—যা একটি composite symbol রচনা করে। ধরা যাক—মনসার মূর্তি। মূলত Zoological দিক থেকে সাপকেই পূজো করা,—বাস্তবতার একেবারে চূড়ান্ত দিক; তারপর সর্পাকৃতি ফণীমনসা গাছ,—এখান থেকেই তা প্রতীক-সঙ্কেতে পরিণত হতে থাকল। শেষে

Anthropomorphic বা নরাকৃতির দেবী মনসা; Zoological এবং Anthropomorphic দিকের composition হয়ে শেষে তৃতীয় আর একটি ভাবনার সৃষ্টি করল। পূর্ববঙ্গে এই দেবীর কেবল মুখটুকু নিয়ে একটি হাঁড়ি বা কলসির ওপর super-impose করা হয়—যা composition-এর আরো একটি স্তরের সূচক। পূজো-অর্চনার বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রায়শই Zoological দিক থেকে Anthropomorphic দিকে বিবর্তন কিংবা এ দুটি দিকে সংমিশ্রণ [composition] এক সাধারণ ব্যাপার।

কাকতাড়ুয়ার ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে। পশু-পাখির Zoological দিক থেকে Anthropomorphic দিকে বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি মধ্যবর্তী মিশ্রিত স্তরকেও কল্পনা করা হয়েছে,—যা Theriomorphic রূপ [যেমন, আমাদের দেশে গণেশের মূর্তি। হাতি এবং মানুষের মিশ্রণ]। 'পঞ্চভূতে'র একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গ্রীকমূর্তি এবং ভারতীয় মূর্তি রচনার মূল পার্থক্যটি প্রদর্শন করেছেন। গ্রীকমূর্তি সত্য ও বাস্তবের অবিকল্প ও বিশ্বস্ত প্রতিমূর্তি। ভারতীয় মূর্তি সেখানে একটি বিশিষ্ট ভাব-ভাবনার প্রতিমূর্তি, সত্যের অনুকরণ সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথ যেটা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লক্ষ্য করেছিলেন, আমাদের মতে সেটি লোকজীবন ও মানসের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট ও বিশদ করে জানা-বোঝা যায়। কাকতাড়ুয়ার মূর্তি রচনার মধ্যে সেই ভাবগত দিকটি প্রাধান্য পায়। কাকতাড়ুয়ার মূর্তিটি এমন হবে, দ্রষ্টার কাছে যা ভীতিজনক বা বিরূপ মনোভাবের দ্যোতক হয়। ইংরেজি Scare Crow কথাটির আভিধানিক অর্থ 'কাকতাড়ুয়া'ই বটে, কিন্তু সেই Lexical এবং Denotative অর্থ পেরিয়ে একটি Marginal ও Connotative অর্থও তাতে কালক্রমে যুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই আলঙ্কারিক ও ইডিয়ম্যাটিক দিক থেকে Scare Crow-এর আর একটি অর্থ : 'অতি অল্প পরিমাণে কাপড়-চোপড় পরা কোনো ব্যক্তি।' যেহেতু কাকতাড়ুয়ার বিশেষ মূর্তি স্বাভাবিক নয়, স্বল্পবাসের কোনো ব্যক্তিও তাই। কাকতাড়ুয়াকে সাধারণত, ড্যাবডেবে চোখ, লম্বা রোগাটে মানুষ, ছেঁড়া জামা-পরা একটি চরিত্র রূপে প্রদর্শন করা হয়। যা দেখে কাক ভয় পাবে, যা দেখে কোনো মানুষ কু-নজর দিতে উৎসাহী হবে না; এবং যা আবার একটি রক্ষণকারী শক্তিরূপেও কাজ করবে। নদীয়া জেলায় তেহট্ট অঞ্চলের মুসলমানেরা একটি বিশেষ রীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কোনো গৃহস্থের কাঁচা ভিটে সিঁধকাঠি দিয়ে খুঁড়ে চোর যদি কিছু চুরি করে নিয়ে যায়, তবে কোনো মরা গোরুর মুখের হাড় [যা দেখতে ভয়াবহ] সেই সিঁধকাটা জায়গায় লাগিয়ে রাখা হয়। এ-কাকতাড়ুয়ার



মতো 'চোর-তাড়ুয়া'! মড়া গোরুর মুখের হাড় সেই গৃহস্থের বাড়ির গাছের ডালেও ঝুলিয়ে রাখতে স্বচক্ষেই দেখেছি। একটি মড়ার খুলি ও দুটি আড়াআড়ি করা হাড় যেমন বিপদের সূচক।

কাক সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ-বিশ্বাসের মধ্যে যেটি 'Redeeming feature' [অর্থাৎ দোষের মধ্যে যা গুণের দিক] সেটিই তাকে ক্ষেতের guardian spirit-এ পরিণত করেছে এবং তখনই তা 'নজর-কাটা'তে বিবর্তিত হয়েছে।

৪.

কাকতাড়ুয়া-র মূর্তি রচনা এবং ফল-ফসলের ক্ষেতে সেটির স্থাপনার দিকটিও একটি আলোচ্য দিক। এক-এক অঞ্চলে এবং সংস্কৃতিতে কাকতাড়ুয়ার মূর্তি, তার গঠনকৌশল কিংবা গঠনের উপকরণ-উপাদানের নানা পার্থক্য দেখা যায়।

ক্ষেতের কোন্ কোণে বা দিকে এটি স্থাপনা করা হবে, তা একটি বিবেচ্য বিষয়। কাক যে কোনো দিক থেকেই উড়ে আসতে পারে, কাজেই দিক্ বা কোণ কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নাও হতে পারে। কিন্তু কার্যকালে এর বিপরীত ঘটনা দেখি। ক্ষেতের মধ্যস্থল এটির অবস্থানের প্রত্যাশিত দিক, তা থাকেও বটে কখনো-কখনো, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেন বিশেষ একটি কোণে বা বিশেষ একটি ভঙ্গিতে তা স্থাপিত হয়? কাকতাড়ুয়ার কোনো vertical উন্নয়ন বা বিবর্তনের ফলে তা কি সেই গোষ্ঠীর Totem-এর স্থান নেয়? Totem শ্রদ্ধেয়, তা অবধ্য, এবং সেই জন্যই কি কাকের সঙ্গম দর্শন সম্বন্ধে নানা Taboo আছে? এ জন্যেই কি কাককে 'সকৃৎগর্ভা' [অর্থাৎ সারা জীবনে একবার মাত্র সে ডিম পাড়ে। এই জন্য যে রমণীর একটি মাত্র সন্তান হয়, তাকে 'কাকগর্ভা' বলে] বলে একটি বিশেষত্ব আরোপ করা হয়! Zoology বা প্রাণিবিদ্যার দিক থেকে এ কথা কতখানি সত্য, তা তাঁরাই বলতে পারবেন, আমার জানা নেই। তবে কাক যে Totem হতে পারে, নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র মিত্র তাঁর একটি রচনায় অনুমান করেছিলেন। ছড়াতে যখন পাই—'সাতটি কাকে দাঁড় বায়', তখন তা কোনো নাবিক গোষ্ঠীর Totem বলে শরৎচন্দ্র মিত্র অনুমান করেছিলেন।

এক-এক গোষ্ঠীর Totem ভিন্ন-ভিন্ন বলেই হয়তো কাকতাড়ুয়ার মূর্তির ভিন্নতাও এসে গেছে। অবশ্য, এর মধ্যে Improvisation একটি বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকে। হাতের কাছে যা মেলে, তাই দিয়েই একটি কিম্ভূতমূর্তি গড়া হল। ক্ষেতের যে দিকটাতে লোক চলাচল অধিক, কু-নজর সে দিক থেকেই আসা সম্ভব, কাজেই সে দিকেই মুখ রেখে কাকতাড়ুয়ার অবস্থান রচিত

হয়। কোথাও ঈশান কোণে তা স্থাপন করা হয়। ঈশান কোণের দিক থেকে ঝড়বৃষ্টি আসতে পারে, অতএব তা ফল-ফসলকে কেবল কু-নজর নয়, প্রাকৃতিক বিপদ থেকেও উদ্ধার করবে। উত্তরপ্রদেশে বিশ্বাস আছে, যে দিক থেকে ঝড় আসবার সম্ভাবনা, বাবুই পাখিরা নাকি সেই দিক ছেড়ে অন্য দিকে বাসা তৈরি করে। ঠিক পূর্ববঙ্গে যেমন বিশ্বাস আছে, মুরগী ছায়াপথের দিকে মুখ করে ডিমে তা দেয়।

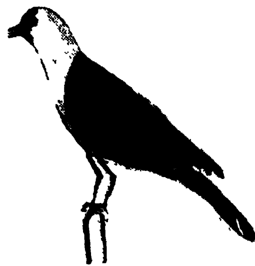
হাঁড়ি বা লাউয়েব শুকনো গোলাকাব খোল দিয়ে হামেশাই কাকতাড়ুয়াব মুখটি তৈরি হয়। দেহটি হয় খড়ের, তাও স্বল্প পবিমাণে। হাঁড়ি বা লাউয়ের শক্ত-শুকনো খোলায় চোখ-মুখ ভুসো কালি দিয়ে মোটা দাগে এঁকে দেওয়া হয়। কখনো চোখে পড়বাব জন্য সৃষ্টি কবা হয রঙের বিপরীত সমাবেশ বা contrast। মনে হয়, এ contrast সৃষ্টি আধুনিক কালের বিশেষ মানসিকতাব ফল। হাঁড়িতে চুন লেপে তাব ওপর চোখ-মুখ এঁকে দিতেও দেখেছি। কখনো দেখা যায়,—মুন্ডবিহীন কাকতাড়ুয়া। আড়াআড়ি করে দুটি কাঠি লাগিয়ে, ছেঁড়া একটি ফুল-হাতা শার্ট পরানো, মুন্ডবিহীন কাকতাড়ুয়াও দেখেছি। হাওয়াতে বেশ নড়া-চড়া করছে, যেন একটি জীবন্ত মানুষ, কাক-পক্ষীর ভয় হবারই কথা। এখানে কাকতাড়ুয়ার কিম্ভূত মূর্তি নয়, ভদ্র-সদ্র মানুষের জীবন্ত প্রতিনিধি স্থাপন কবে কাক-পক্ষীদেব ঠকানো। ঐ ঠিক যেন সুন্দরবনের বাওয়ালিদের 'বাঘ-তাড়ুয়া' সাজা। বাঘ সর্বদাই তাব শিকারকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে [সিংহ যেমন সর্বদাই সামনে থেকে, এ জন্যেই সে পশুরাজ], এই তথ্যানুসারে মুখের পেছন থেকে বাওয়ালিরা মানুষের মুখোস এঁটে নেয়,—বাঘ মনে করে তার শিকার সম্মুখে চেয়ে আছে।

কাক-তাড়াবার জন্য আরও দু-টি রীতির আশ্রয় নিতে দেখেছি। একখণ্ড লাল বা অন্য রঙের কাপড় কোনো কিছুব সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে; কিংবা একটি তীর-ধনুক টাঙিয়ে রাখতে। লাল বা রঙিন বস্ত্রখণ্ডকে হাওয়ায় উড়তে-নড়তে দেখলে কাক-পক্ষী তাকে সচল-সজীব মানুষ বলে মনে করে; ঠিক যেমন তীর-ধনুক দেখলে ওরা মনে করে কোনো শিকারী ওদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে আসছে।



কাক : বাঙলার লোকসাহিত্যে

মানস মজুমদার



এক. প্রসঙ্গ : কাক

এদেশের পাখি-সমাজে আদমসুমারীর কোনো ব্যবস্থা নেই। থাকলে দেখা যেতো, সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে রয়েছে বায়সকুল; অর্থাৎ কাকের দলটি।

'কাক' নাম হ'ল কেন? 'কা-কা' করে তাই। অকুলীন চেহারা, না আছে শ্রী, না সৌন্দর্য। অমাবস্যার অন্ধকারকে হার মানায় তার দেহবর্ণ, কণ্ঠস্বর রুক্ষ কর্কশ, খাদ্য-খাদ্যের বিচার করে না, লোভ অপরিসীম, বুদ্ধিতে প্রখর, সাহসে দুর্জয়, বৃত্তিতে তস্কর, চালচলনে সুচতুর। 'কাক' স্বতোঘোষীভবনহেতু কখনো 'কাগ', কখনো বা আঞ্চলিক উচ্চারণে 'কাউয়া' ও 'কৌয়া'।

বাঙলার লোকজীবনের মতো বাঙলার লোকসাহিত্যেও কাকেদের সরব উপস্থিতি। কাকের দৈহিক রূপ, আচার-আচরণ, গতিবিধি যেমন বাঙলার লোকসাহিত্যে ধরা পড়েছে, তেমনি তত্ত্বের বাহনরূপেও কাকের আবির্ভাব ঘটেছে। কাক কখনো রূপক বা প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত; কখনো বা লোকমনস্তত্ত্বের আশ্রয়; কখনো কখনো আবার উপমা-রূপক- উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারের উৎস। বাঙলার লোকসাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করলেই একথার সত্যতা প্রমাণ হবে।

দুই. ছড়ায় কাক

সুপরিচিত একটি ছেলেভুলানো ছড়ায় আহার-অনিচ্ছুক খোকনকে আহার ইচ্ছুক করে তুলতে কাকের উল্লেখ ঘটে:

১. খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন আমাদের কার বাড়ি?
আয়রে খোকন ঘরে আয়,
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।[১]

কাকের এই উল্লেখ স্পষ্টতই মনস্তত্ত্বনির্ভর। শিশু আধিপত্যপ্রবণ। অন্যের আধিপত্য সে পছন্দ করে না।

আলোচ্য ছড়ায় সেই শিশু-মনস্তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে খোকনকে আহাব মনোযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত আব একটি ছড়ায় সূচনা-পংক্তিদ্বয় স্মবণ কবা যেতে পারে:

২. কা কা কা কাকেব ছানা,
ভাত খায় না খোকন ধনা।[২]

বলা বাহুল্য, ছড়া দু-টিতে কাকের ভূমিকা পার্শ্ব চবিত্রের। নায়ক-মর্যাদা প্রাপ্য খোকনেরই।

বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত নিম্নোক্ত ছড়াটিতে কাককে শিশুর সঙ্গী কল্পনা করা হয়েছে:

৩. আয়রে কাগা বসরে ডালে।
ভাত দিব তুকে সোনার থালে॥
খাবি দাবি কলকলাবি।
খোকাকে নিয়ে খেলা দিবি॥[৩]

ছড়াটি আহ্বানমূলক। উদ্দেশ্য খোকার মনোবঞ্জন। কাককে শিশুর সঙ্গী কল্পনায় কৌতুক রসেব স্ফুরণ ঘটেছে।

মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত কাকের সঙ্গে শিশুর আত্মীয় সম্পর্কজ্ঞাপক ছড়াগুলি যুগপৎ কৌতুক রসাত্মক ও শিশু-মনস্তত্ত্বের নিদর্শন। যেমন:

৪. কাওয়া নানা। / এক আম দে না।[৪]

অর্থ: 'কাক 'নানা' [মাতামহ] একটা আম দে না।' কাকের কাছে শিশুর আম প্রার্থনার ছড়া। কাক গাছের উপবে, শিশু গাছের নিচে মাটিতে। কাকেব কাছে আম সহজলভ্য, শিশুর কাছে দুর্লভ। শিশু তাই কাক-'নানা'র কাছে আম প্রার্থনা করে। পূর্বোক্ত ছড়াগুলির কথক শিশু নয়, অন্য কেউ। সম্ভবত ওগুলির নেপথ্যে রয়েছে কোনো কথয়িত্রী। কিন্তু এ-ছড়ায় বা এ-ধরনের ছড়ায় কথক স্বয়ং শিশু। শিশুর সহজ সরল বিশ্বাসে কাক 'নানা' হয়ে ওঠে। কেন না 'নানা' শিশুর খুবই প্রিয়। 'নানা'-র কাছে সহজেই আব্দার করা চলে। কাককে তাই শিশু 'নানা'-রূপে কল্পনা করে। কাকের ওপর নরত্ব আরোপিত হয়। এ হল Anthropomorphism। এ-ধরনের অন্য ছড়াগুলিতেও নরত্বারোপের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, মালদহের 'গম্ভীরা' গানেও শিবকে 'নানা'রূপে সম্বোধন করা হয়। শব্দটি হিন্দী, মারাঠী এবং ওড়িয়া ভাষায় দেখা যায়। বাঙলার মুসলমান সমাজেও

ব্যবহৃত। সে যাই হোক, 'নানা' শিব কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই সমাদৃত। আলোচ্য ছড়াটিও এ-অঞ্চলের উভয় সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে প্রচলিত। সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির নিদর্শন আর কি!

৫. কউয়া রে কাক্কা।
আম ফেলে দে পাক্কা॥[৫]

অর্থ: 'কাকা-কাকা আম ফেলে দে।' কাকের কা-কা ধ্বনিসূত্রেই 'কাক্কা' অর্থাৎ 'কাকা'র আবির্ভাব। কাকও শিশুর আপনজন।

৬. কউয়া রে মামু।
আম ফেলে দে খামু॥[৬]

অর্থ: 'কাক-মামু, আম ফেলে দে, খাবো।' কাক এ ছড়ায় শিশুর মাতুল পদ লাভ করেছে। 'মামা' আদরার্থে হয়েছে 'মামু'।

অনুরূপ আর একটি ছড়া মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত:

৭. কাগা আমার ঠাকুভাই।
আম ফালা বাড়িত যাই॥[৭]

অর্থ: 'কাক আমার বড় ভাই, আম ফেল্ বাড়ি যাই।' কাক এ-ছড়ায় শিশুর দাদা। লক্ষণীয়, এ-ধরনের প্রতিটি ছড়ায় শিশুর মুখের ভাষাটি অবিকৃতভাবে রক্ষিত। কাক 'তুই' রূপে সম্বোধিত। এ সম্বোধন অবজ্ঞাবাচক নয়, আদরার্থক।

বহুল প্রচলিত ছেলেভুলানো একটি ছড়ায় কাকের দল নৌকার দাঁড়িরূপে কল্পিত:

৮. খোকন খোকন করে মায়,
খোকন গেল কাদের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়,
খোকন রে তুই ঘরে আয়।[৮]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র মিত্র উক্ত ছড়ার ব্যাখ্যায় দাঁড়ি কাককে নৌজীবী কোনো গোত্রের 'কুলপ্রতীক' [totem]-রূপে নির্দেশ করেছেন: '.....most likely the Indian house-crow was the totem of some forgotten clan of boatmen,.....'[৯]

ব্যাখ্যাটি অনুমাননির্ভর বলেই মনে হয়। কেননা, ছেলেভুলানো ছড়ায় ভোঁদড় বা টিঁয়ার যে উল্লেখ পাই সেগুলি সম্পর্কেও তাহলে এ ধরনের

প্রশ্ন উঠতে পারে। বস্তুত শিশুকে উপলক্ষ করে এ সমস্ত ছড়ায় স্বপ্ন-কল্পনা ও কৌতুকের মিশ্রণে উপভোগ্য এক আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'সাত' সংখ্যাটি লোকসমাজের খুব প্রিয়। 'সাত রাজার ধন', 'সাতমহলা প্রাসাদ', 'সাতনরী হার' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। এভাবেই সাত কাকের আর নদীমাতৃক বাঙলায় নৌকার উপর বা দাঁড়ের উপর কাকের দলের বসে থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ছড়ায় পাই তারই সরস চিত্ররূপ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়ার অংশবিশেষ প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে:

৯. সাত কাউআ আইএ যায়।
পাড়ার মাঝে গু খায়।[১০]

আলোচ্য ছড়ার 'সাত কাউআ'র ব্যাখ্যা তাহলে কী হবে?

মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত কাক সম্পর্কিত কৌতুকরসাত্মক একটি ছেলেদের খেলার ছড়া:

১০. কাউয়া ভাই কা-কা।
দুইখার মারে লইয়া যা॥
কোন্‌দিন আইবে কইয়া যা॥[১১]

বছরের অন্য সময়ে কাক-সম্পর্কে যত বিরূপতাই থাক না কেন, অগ্রাণ মাসে নবান্নের দিনটিতে কিন্তু কাকেদের প্রতি বাঙলার লোকসমাজের আচরণ ভিন্ন ধরনের। এদিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে 'পার্বণ' করে কাককে 'বলি' [কলাপাতায় বা কলার ডোঙায় নতুন ধানের আতপ অন্ন, ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি কাককে খাওয়ানো] দেওয়া হয়। কাক ঐ 'বলি' গ্রহণ করলে গৃহস্থ নতুন অন্ন মুখে দেয়। কাকের 'বলি' গ্রহণ পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টির পরিচয়বহ। লোকসমাজের তাই বিশ্বাস, কাক 'বলি' গ্রহণ করলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। 'কাক-বলি' সম্পর্কে পুরাণ-প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে: 'কশ্যপ ও তাম্রার একটি সন্তান কাকী; এই কাকী থেকে সমস্ত কাকের জন্ম। মরুত্ত যজ্ঞে ধর্ম কাকের রূপ ধরে পালিয়েছিলেন। ফলে ধর্ম কৃতজ্ঞতায় বর দেন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে দত্ত তণ্ডুল বলি দিলে সেই বলি কাকেরা পাবে।'[১২] সে যাই হোক, বরিশাল জেলা থেকে সংগৃহীত দু-টি নবান্নের ছড়ায় 'কাকবলি' প্রথার উল্লেখ কিভাবে ঘটেছে, তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

১১. কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা। কাক বলি লবা॥

পাতি কাউয়া লাথি খায়, দাঁড় কাউয়া কলা খায়,
কো কো কো, মোব গো বাড়ী শুভ নবান্ন॥[১৩]

ছড়াটিতে কাকের ডাকের অনুকবণ করে ['কো কো কো'] কাককে শুভ নবান্নের বলি গ্রহণে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাতিকাকের প্রতি কিন্তু অবজ্ঞা প্রদর্শিত। ছড়াটির সংগ্রাহক মনোবঞ্জন গুহঠাকুরতা ছড়াটি সম্পর্কে জানিয়েছেন : '.....নবান্নের পূর্বরাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সকল গৃহের বালক-বালিকাগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং দলে দলে ঘরের বাহিব হইয়া পক্ষিগণের কলরবের সঙ্গে তাহাদেব বালকণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে একপ্রকাব সুব ধবিয়া দাঁড়কাকদিগকে নিমন্ত্রণ কবিতেছে; সে নিমন্ত্রণেব সঙ্গীত বা ছড়া এই.....।'[১৪]

১২. দাঁড় কাউযাবে আহ্বান কর‍্যা
পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া
কোঁ কোঁ কোঁ
আজ কৈলাম মোগো বাড়ি শুবো নবান্নো।
আইয়ো যাইয়ো কাক বলি লইয়ো
আত বর‍্যা সন্দেশ দিমু
পেট্টি বব্যা খাইয়ো॥[১৫]

এ-ছড়ায় কিন্তু দাঁড়কাককে আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পাতিকাককেও 'বলি' দেওয়া হয়েছে। হাত ভরে সন্দেশ দানের প্রতিশ্রুতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পেট ভরে তা খাওয়ার অনুরোধ। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, পাতিকাকের তুলনায় দাঁড়কাক আকারে বড়ো। এদের ঠোঁটও বড়ো এবং ভারি। গলার স্বর অনেক বেশি কর্কশ।

তিন. প্রবাদ-প্রবচনে :

বাঙলার লোকসাহিত্যে কাক-সম্পর্কিত প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের সংখ্যা কম নয়। কাক এগুলিতে কখনো লক্ষ্য, কখনো বা নিতান্তই উপলক্ষ।

কাক কালো, কিন্তু তার ডিম ফিকে নীলচে সবুজ, বাদামী দাগ ও ছিট যুক্ত। অথচ তা থেকে কালো শাবকের জন্ম হয়। প্রবাদে অবশ্য পাই: 'কাকেরও ডিম সাদা হয়।' তুলনীয়: 'কালী মুরগী সফেদ অণ্ডা' [হিন্দী] এবং 'A black hen lays white eggs' [ইংরেজি]। কাকের ডিমের

বর্ণ সম্পর্কে প্রবাদ যে অসতর্ক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মূল বক্তব্যটি তাতে লঘু হয় না। এ-প্রবাদ স্মরণ করিয়ে দেয়, আপাত দৃষ্টিতে যা অসম্ভব, বস্তুত তা সম্ভব হতে পারে।

গোপন কাজকর্মে গোপনতা বজায় রাখতে 'কাক পক্ষী টের না পায়' এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা অনেক সময় নিয়ে থাকি বৈকি! প্রশ্ন জাগে, এত পাখি থাকতে কাকের উল্লেখ ঘটলো কেন? উত্তরে বলা যায়, লোক-সাধারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এমনটি ঘটেছে। কে না জানে, কাকের নজরটি বেশ তীক্ষ্ণ। উঁচু গাছ বা উঁচু বাড়ির মাথা কিংবা আকাশের উপর থেকে অনেক দূর অবধি কাক দেখতে পায়। রাতের বেলা ঘুমেব মধ্যেও সজাগ থাকে। রাত না পোহাতেই তার দিন শুরু হযে যায়। কাকের চোখ এড়িয়ে কোনো কিছু করা সত্যই কঠিন। নিশ্ছিদ্র গোপনতা বোঝাতে তাই কাকের টের না পাওয়ার কথা বলা হয়।

কাক অত্যন্ত চতুর পাখি। প্রবাদে তা তির্যক ভঙ্গিতে স্মবণ কবিয়ে দেওয়া হয়েছে: 'কাক মনে করে—আমি বড় সেয়ানা'। গ্রামের তুলনায় শহরের কাক বেশি চতুর: 'শহরে কাক, বড় চালাক'। কাকের চতুরভাব পরিচয় দানে তুলনামূলকতার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। চাতুরীতে পাখি-সমাজে যেমন কাক শ্রেষ্ঠ, হিন্দু-সমাজে তেমনি কায়স্থ শ্রেষ্ঠ। পাখি-সমাজে কাক যেন চতুর কায়স্থ, আর হিন্দু-সমাজে কায়স্থ যেন চতুর কাক। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে: 'কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত'। ব্যাজস্তুতি আর কী! কাক ও কায়েত [কায়স্থ] সম্পর্কিত একটি প্রবাদে পাই:

১. কায়েত মরে জলে ভাসে,
কাক বলে—ফিকিরে আসে।

[অর্থাৎ: কায়েতের মৃতদেহ জলে ভাসলেও, কায়েতের মৃত্যু সম্পর্কে কাকের সন্দেহ যায় না।] আর তাই:

'কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।'

অর্থ: কায়েতের মৃতদেহ কাকেও এড়িযে যায়।

অন্যত্র প্রতিতুলনাসূত্রে পাই নাপিতের উল্লেখ: 'মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখির মধ্যে কাউয়া।'

'পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়'—প্রবাদটিতে কাক-সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ। আবার অযোগ্য ব্যক্তির উপাদেয় দ্রব্য উপভোগে

আক্ষেপোক্তি: 'হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।' 'কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না'—এও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। কাক সমস্ত প্রাণীর মাংস খায়, কিন্তু কাকের মাংস অভক্ষ্য, কেননা কাক নোংরা বস্তু খায়। এ-প্রবাদের অবশ্য একটি রূপক অর্থও আছে। তা হল, অধম ব্যক্তি সকলেরই অনিষ্ট করে থাকে। কিন্তু সে এতই ঘৃণ্য যে কেউ তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করতে চায় না। আর 'কাক কাকের মাংস খায় না'—এ প্রবাদের গূঢ় অর্থ হল, সমধর্মী বা সমব্যবসায়ীর অনিষ্ট কেউ করে না। তুলনীয়: 'জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না' এবং 'one raven will not pluck another's eyes'.

'এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসী মালা'—প্রবাদটি ভণ্ড ধার্মিকের প্রতি ব্যঙ্গের নিদর্শন। সমধর্মী দৃষ্টান্ত: 'ডেঙরা কাক বলে—আমি করব একাদশী'। 'কপালে থাকলে গু, কাকেও এনে দেয়'—এ-প্রবাদে অদৃষ্ট নির্ভরতার প্রকাশ। জোগানের তুলনায় চহিদা বেশি বোঝাতে কাকের সাহায্য নেওয়া হয়: 'আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল।' একের দোষে অন্যকে দায়ীকরণ: 'কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা'। তুলনীয়: 'কাগীকে হাত সন্দেশ [হিন্দী] কাণ্ডজ্ঞানহীনতার দৃষ্টান্ত; 'কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান'। তুলনীয়: 'কৌয়া কান লে গয়া' [হিন্দী]। উৎসাহের আধিক্য নির্দেশ: 'কাকে নূতন গু খেতে শিখেছে'। 'কাকের উপব কামানের চোট'—অবিবেচনাপ্রসূত উত্তেজনার দৃষ্টান্ত। 'কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়'—ন্যাকামি ও ভণ্ডামির উদাহরণ। 'কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার'—কার্য-কারণ সম্পর্কহীনতার পরিচায়ক। 'ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে'—তা তো সবলের অসহায় দুর্বলকে আক্রমণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদানের উদাহরণ: 'ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি'। যাতে নিজের কোনো উপকার নেই, এমন ব্যাপার ভালো হোক মন্দ হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রবাদে তাই শুনি: 'বেল পাকলে কাকের কি?' পয়সা থাকলে মানুষ বা জিনিসের অভাব হয় না। প্রবাদ সেকথা জানিয়ে দেয়: 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।' 'মরা কাকের আবার চড়কের ভয়': তাৎপর্য, কোনো শাস্তিতেই মৃতের ভয় নেই। সংসারে বা পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়, কেননা, 'যে-দেশে কাক নেই, সে-দেশে কি রাত পোহায় না?' দুর্যোগ-দুর্বিপাক

প্রবলকেও রেহাই দেয় না: 'শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে।' আতিশয্য ও আদিখ্যেতার দৃষ্টান্ত: 'সোনার দাঁড়ে কাক বসানো'।

কোকিলকে বাদ দিয়ে কি কাকের কথা সম্পূর্ণ হতে পাবে? 'কাক-কোকিল' সহচর শব্দ। কোকিল 'আকারে প্রায় কাকেব সমান, তবে আরো পাতলা গড়নের আর পুচ্ছটিও কাকের চেয়ে বড়ো। পুরুষ কোকিলের দেহটি ঝকঝকে উজ্জ্বল কালো, হলদেটে সবুজ ঠোঁট এবং চোখ দুটি রক্তের মতো লাল। স্ত্রী কোকিলের দেহের রঙ বাদামী, তার উপর সাদা ছিটছিট দাগ আছে।'[১৬] কাকেব বাসায় কোকিলেব জন্ম ও বৃদ্ধি [কোকিলের আর এক নাম তাই 'কাকপুষ্ট']। 'কাকেদের বাসাতেই এরা ডিম পেড়ে রাখে। .....নিজেরা কোনো বাসা বানায় না, এদের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোব কাজটা কাকেরাই কবে দেয়, এদের বাচ্চাবাও বডোও হয় ঐ পবের ঘবেই। .....ডিমগুলির রঙ বাদামী সবুজ, তাতে লালচে বাদামী ছিট থাকে, ডিমগুলি দেখতে অনেকটা কাকের ডিমের মতোই শুধু আকারে কিছুটা ছোটো।'[১৭] প্রবাদে পাই: 'কাকের বাসায় কোকিলেব বাস'। একের শ্রমের ফল অন্যে বিনাশ্রমে উপভোগ করে, প্রবাদটিতে সেই নির্মম সত্যের প্রতিফলন।

কাকের বাসায় জন্ম, কাক-মাতাব দ্বারা লালিত পালিত; কিন্তু প্রথম কণ্ঠস্বরেই কোকিল শাবকের স্বাতন্ত্র্যটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'কাকের বাসায় কুলির ছা, জাত-স্বভাবে কাড়ে রা'। শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রভাবে কারও জন্মগত প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটে না, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়। কাক ও কোকিলের দেহবর্ণে পার্থক্য নেই, পার্থক্য রয়েছে কণ্ঠস্বরে। কাকের কণ্ঠস্বর কর্কশ, পক্ষান্তরে কোকিল সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী। প্রবাদে সেই পার্থক্যটুকু নির্দেশিত: 'কাক-কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।' এ-প্রবাদের একটি রূপক তাৎপর্যও রয়েছে। তা হল মহৎ ও হীনকে আকৃতিতে চেনা যায় না, চেনা যায় আচরণে। কাকের কণ্ঠে যে কোকিলের স্বর প্রত্যাশা করা যায় না, প্রবাদ সেকথা স্মরণ করিয় দেয়: 'কাকের মুখে কি কোকিলের রা?' বস্তুতপক্ষে যে হীন তার কাছে ভদ্র আচরণ প্রত্যাশা করা চলে না। কাক-কোকিলের কণ্ঠস্বর বিষয়ে প্রচলিত নিম্নোক্ত প্রবাদটি বেশ তীক্ষ্ণ:

'কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা।'

কাকের বাসায় কোকিল-শাবকের জন্ম হয়। ক্রমে সে উড়তে শেখে এবং কাকের বাসা থেকে পলায়ন করে। প্রবাদে তার সমর্থন: 'কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।' উপকারের প্রত্যুপকার নেই, স্বার্থসর্বস্ব জীবন।

সে যাই হোক, কাক আর কোকিলে পার্থক্য আছে। প্রবাদের রায় যথার্থ: 'কাক-কোকিলের সমান দর' হতে পারে না। যেখানে সমান দর করা হয়, সেখানে দোষগুণ বিচারের যে অভাব ঘটে, তাতে সন্দেহ নেই।

'কাক-বক' সহচর শব্দ। বাঙলা প্রবাদে কাকেব সঙ্গে বকের উল্লেখও দেখা যায়। যেমন, 'সাতবার করে সিনান, কাক নয় বকের সমান'। সাতবার স্নান করেও কাক বকের মতো ফর্সা হতে পারে না। অর্থাৎ, বাহ্য আচরণে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে না।

'কাক-চিল' সহচর শব্দ। কাক ও চিল কলরবের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু কখনো কখনো মানুষের চীৎকার কাক-চিলের কলরবকেও ছাপিয়ে যায়। অবস্থা এমন হয় যে সেখানে—'কাক-চিল বসতে পায় না'। অর্থাৎ সুখশান্তি বিনাশকর চীৎকার।

বলতে হয় প্যাঁচার কথাও। কাক প্যাঁচার শত্রু। তুলনামূলকতার দ্বারা এই শত্রুতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে: 'চুলের শত্রু টাক, প্যাঁচার শত্রু কাক।' প্যাঁচা কাককে ভয় পায়, প্যাঁচাকে তাই 'কাকভীরু' বলা হয়। স্বভাবতই প্যাঁচা কাক-বিদ্বেষী: 'পেঁচক নিন্দে কাকের বোল'। কাকের সর্বনাশে প্যাঁচার উল্লাস: 'কাক মরল ঝড়ে, প্যাঁচা বলে—আমার শাপ লাগল হাড়ে হাড়ে'। প্রবলের বিপর্যয়ে দুর্বলের আস্ফালন আর কী! মিথ্যা আস্ফালনের একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়: 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে'।

একে অন্যের পিছনে লেগে অবিরত যখন উত্যক্ত করে তখন বলতে শুনি 'কাকের পিছে ফিঙে লাগা'র কথা।

অধমের দ্বারা চালিত হলে মহত্তেরও বিপদ ঘটে। কাক যদি হাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, তবে পথে কোথাও পাঁক থাকলে কাক তার উপর দিয়ে নিরাপদে উড়ে যায়, কিন্তু হাতি পাঁকে ডুবে যায়। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে: 'কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতিও পাঁকে পড়ে'।

'কাক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই'—অর্থ হল দুটি বস্তুর তত্ত্বগত পার্থক্য বুঝতে না পারা।

ডাকের বচনে শুনি ঘর থেকে কোথাও যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত ইতর প্রাণীদের দর্শন নিষিদ্ধ। তালিকার প্রথমেই রয়েছে কাকের নাম: 'কাক নাক ফণী, মাকড় গোধা। সমুখে দেখিতে পাইব বাধা।।' অর্থাৎ: কাক, খাঁদা-বোঁচা মুখ, সাপ, মাকড়শা আর গোসাপ কোথাও যাত্রাকালে বিঘ্নসৃষ্টিকারক। ডাকের বচনে তাই সতর্কীকরণ।

কাক-সম্পর্কিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১. 'কাকের মুখে কৃষ্ণকথা'। অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর ব্যাপার।

২. 'কাকের লুকিয়ে রাখা।' কাক অত্যন্ত চতুর, অতিশয় সাবধানী। পাছে অন্য কাক চুরি করে তাই এমন স্থানে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখে যে সে নিজেই পরে তা খুঁজে পায় না। কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু সযত্নে কোথাও রেখে দিয়ে তা খুঁজে না পেলে এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশ তার সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়।

৩. 'কাকের মুখে সিঁদুরে আম'। অযোগ্য ব্যক্তির উপাদেয় সামগ্রী উপভোগ!

৪. 'কাগের ছা বগের ছা'। হিজিবিজি কিম্ভূত কিমাকার হাতের লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কাগ-বগেব ছানার মতো কালো সাদা লেখা। অক্ষরের কোনো অংশে কালি লাগা, কোনো অংশে কালি না লাগা।

৫. 'কাগা-বগা করে খাওয়া'। ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়া।

৬. 'কাগী-বগী ভস্ম করা'। অর্থ: প্রবলের কোপে দুর্বলের বিনাশ। কোপানলে কাগী-বগী পুড়িয়ে মারা। উৎস: মহাভারতের বনপর্বের ২০৫ সংখ্যক অধ্যায়ের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোপানলে বলাকা-বধ-প্রসঙ্গ।

৭. 'কাগার শত্রু বগা'। কাক ও বকের পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতার।

৮. কোনো কিছু সম্বন্ধে লোক-পরম্পরায় বা জনরবে অবগত হওয়া হল 'কাকের মুখে খবর পাওয়া।'

কাক-আশ্রয়ী বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের উদাহরণ:

১. 'কাকস্য পরিবেদনা'। উৎস একটি সংস্কৃত শ্লোক: 'কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ। কায়ে প্রাণে ন সংবন্ধঃ, কা কস্য পরিদেবনা'। বর্ণবিপর্যয়ে 'পরিদেবনা' বাঙলায় হল 'পরিবেদনা'।

২. 'কাক-জ্যোৎস্না'। যে জ্যোৎস্নায় রাত্রিকে ঊষা বলে ভুল করে কাকের দল বাসা ছেড়ে উড়তে থাকে।

৩. 'ঝোড়ো কাক'। ঝড়ে বিপর্যস্ত কাক। শান্ত বিপর্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

৪. 'কাকতালীয়'। কার্য-কারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত কূট প্রশ্নের দৃষ্টান্ত। তালগাছে পাকা তালের উপর বসে থাকা কাক উড়ে গেল এবং তালটি নীচে পড়ে গেল। এ ঘটনার কার্য-কারণ নির্ণয়ে প্রশ্ন ওঠে যে কাক সহসা উড়ে যাওয়ায় তালটি নাড়া খেয়ে পড়লো অথবা পাকা তালটি আপনা থেকে খসে পড়ার ফলে কাক আশ্রয়চ্যুত হয়ে উড়ে গেল।

৫. 'তীর্থের কাক'। তীর্থক্ষেত্রে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। তাদের উচ্ছিষ্ট পুজোর 'বলি' খাওয়ার জন্য কাকের দল অপেক্ষা করে। কোনো কিছু প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষমান উমেদার বোঝাতে এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়।

৬. 'নবান্নের কাক'। নবান্ন-উৎসবে 'কাকবলি' ভোজনের জন্য অপেক্ষমান কাকের দল। প্রাপ্তির আশায় ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা।

৭. 'ভুশণ্ডী কাক'। দীর্ঘজীবী বহুদর্শী কাক। অশীতিপর বহুদর্শী অর্থে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত।

৮. 'কাক-সকাল'। ঊষাকাল। কাকের দল ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন ডাকতে শুরু করে।[১৮]

চার. লোককথায় কাক

বহুল পরিচিত একটি লোককথায় কাককে খল নায়ক রূপে দেখা যায়। তার খল স্বভাবের জন্য কাক শেষপর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত। রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' [ঢাকা, ১৯৫৮] গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি উদ্ধার করছি:

এক চড়ুই আর এক কাক ছিল। একদিন দু-জনে এক বাজি রাখল। এক তলই চিনা ও এক তলই মরিচ নিয়ে কথা হল—কাক মরিচের তলই ও চড়ুই চিনার তলই খাবে। যে আগে খাবে সে অপরের বুক খাবে। খাওয়া আরম্ভ হল। মরিচ চিনার চেয়ে বড় জিনিস, তদুপরি কাকের ঠোঁটও বড়, সেই আগে মরিচের তলই সাবাড় করল। কাকের জিত হল। বেচারী চড়ুই—তার ঠোঁট ছোট, তদুপরি চিনাও ছোট জিনিস, তার তলই শেষ হল না। সুতরাং কাক তার বুক খেতে উদ্যত হল। তখন চড়ুই বলল: 'আমার বুক খাবে এতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি হল, তোমার এ ঠোঁট দিয়ে তুমি কত কিছু খাও। কাজেই তোমার ঠোঁটটা একটু ধুয়ে এসো'। একথা শুনে কাক নদীতে ঠোঁট ধুতে গেল এবং নদী বলল:

'নদীরে নদী
দিতা পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক॥'

নদী শুনে বলল — 'তুমি কত কিছু খাও ; কাজেই আমার পানিতে তোমার ঠোঁট ভিজাতে দেব না। তবে একটা ঘটি এনে এক ঘটি পানি তুলে নিতে পার'। কাক চলল তখন কুমারের কাছে ; গিয়ে বলল :

'কুমার রে কুমার
দিতা ঘটি,
তুলতাম পানি,
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক॥'

কুমার বলল —'ঘটি নেই। তবে যদি মাটি এনে দিতে পার, তা হলে ঘটি বানিয়ে দিতে পারি'। কাক গেল তখন মাটির কাছে। বলল :

'মাটি রে মাটি
দিতা মাটি
বানাইত ঘটি
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক॥'

মাটি বলল : 'আমার বুক বড় শক্ত, কি করে খুঁড়বে ? একটা শিং নিয়ে এস'। কাক চলল তখন মোষের কাছে। গিয়ে বলল :

'ভইষা রে ভইষা,
দিতা শিঙা,
খুড়ত মাটি
বানাইত ঘটি
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক॥'

কিন্তু মোষ তার শিং ভেঙ্গে দিতে রাজি হলো না। সে বলল, 'তোমার

মাটি খোঁড়ার জন্য আমি কেন আমার শিং ভেঙ্গে দেব? তা হলে আমার চল্‌বে কিরূপে?'

এবারে কাকেব গোঁসা হলো। সে মোষকে মারার জন্য চলল কুকুরের কাছে, গিয়ে বলল :

'কুতু রে কুতু
মার ভইষা,
নিতাম শিঙ্গা,
খুঁড়ত মাটি
বানাইত ঘটি
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক'॥

কুকুর বলল—'আমি বড় দুর্বল; আমাকে যদি একটু দুধ খাওয়াতে পার, তা হলে আমি মোষকে মেরে দিতে পারি'। কাক তখন চলল গাইয়ের কাছে। গিয়ে বলল :

'গাভী রে গাভী
দিতা দুধু
খাইত কুতু,
আইত লুতু,
মারতো ভইষা,
নিতাম শিঙ্গা
খুঁড়ত মাটি
বানাইত ঘটি
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক'॥

গাভী বলল—'আমি কয়েকদিনের অনাহারী; যদি আমাকে কিছু ঘাস খাওয়াতে পার, তা হলে আমি দুধ দিতে পারি।' গাভীর কথা শুনে কাক গেল তখন ঘাসের কাছে; গিয়ে বলল :

'ঘাসি রে ঘাসি
নিতাম তোরে,

খাইত গাভী
দিত দুধু
খাইত কুতু
অইত লুতু
মারতো ভইষা,
নিতাম শিঙ্গা
খুঁড়ত মাটি
বানাইত ঘটি
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক'॥

ঘাস বলল—'আমাকে যে নেবে, কাটবে কিসে? একটা কাঁচি নিয়ে এস'। কাক অমনি চলল কাঁচি আনতে। গিয়ে কামারকে বলল:

'কামার রে কামার,
দিতা কাঁচি
কাটত ঘাসি
খাইত গাভী
দিত দুধু
খাইত কুতু
অইত লুতু
মারতো ভইষা
নিতাম শিঙ্গা
খুঁড়ত মাটি
বানাইত ঘাটি,
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক'॥

কামার বলল: 'কাঁচি কোত্থেকে নেবে, আমার তা নিভে গেছে। যদি ঐ গৃহস্থবাড়ি থেকে একটু আগুন এনে দিতে পার, তা হলে কাঁচি তৈরি করে দিতে পারি।' কাক চলল, এবার গৃহস্থ বাড়িতে। গিয়ে গৃহস্থকে বলল:

'গিরছ রে গিরছ,
দিতা আগুন,
ধরাইত তাও
বানাইত কাঁচি
কাটত ঘাসি
খাইত গাভী
দিত দুধু
খাইত কুতু
অইত লুতু
মারতো ভইষা
নিতাম শিঙ্গা
খুঁড়ত মাটি
বানাইত ঘটি,
তুলতাম পানি
ধুইতাম ঠোঁট
তবে খাইতাম চড়ইর বুক'॥

গৃহস্থ বলল: 'আগুন তো নিতে পার, কিন্তু নেবে কিসে?' কাক বলল—'কয়েকটা পাট-শোলাতে আগুন ধরিয়ে সেগুলি আমার পালকে গুঁজে দাও'। গৃহস্থ তাই করল। কাক মনের খুশিতে আগুন নিয়ে চলল কামার বাড়ির দিকে। কিন্তু, একটু দূর যেতে না যেতেই বাতাসের বেগে সমস্ত পাট-শোলায় আগুন জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাক পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। সরল-প্রাণ চড়ুই প্রাণে বাঁচল।

স্মরণযোগ্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-তে [১৯১১] 'চড়াই আর কাকের কথা' নামে এ-কাহিনী কথান্তরসহ মুদ্রিত। উপেন্দ্রকিশোর পূর্ববাঙলার লোকসমাজ থেকেই কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন।

কাহিনীটিতে কাক ও চড়ুই—শোষক ও শোষিতের প্রতিভূ। কাক শক্তিমান চড়ুই শক্তিহীন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বুদ্ধিবলে শক্তিহীন চড়ুইয়ের জয় হয়েছে। 'দুর্বলের জয়' [Triumph of the weak: L300] এই আন্তর্জাতিক Motif—আশ্রয়ে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। কাহিনীভুক্ত ছড়াব ক্রমপুঞ্জিত [cumulative] রূপটি স্বভাবতই চোখে পড়ে। কাক চড়ুইয়ের বুক অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড

খেতে চেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথায় হৃদ্‌পিণ্ড খাওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিশ্বাস, অন্যের হৃদ্‌পিণ্ড ভক্ষণে প্রবল জীবনীশক্তির অধিকারী হওয়া যায়।

এ-প্রসঙ্গে কাকভুশণ্ডীর কাহিনীটি স্মরণ করা যেতে পারে। কাকভুশণ্ডী সুমেরুর উত্তরে এক সরোবরের তীরে বাসকারী অমর কাক। ভুশণ্ডী আসলে ব্রাহ্মণ। লোমশ মুনির অভিশাপে কাকে রূপান্তরিত। ভুশণ্ডী তত্ত্বজ্ঞানী, রামভক্ত, ত্রিকালজ্ঞ। ভুশণ্ডী রচিত রামায়ণ 'ভুশণ্ডী রামায়ণ' নামে পরিচিত। ভুশণ্ডীর উল্লেখ রয়েছে 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'-এ, তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এ। 'কাকভুশণ্ডী'র কাহিনীর উদ্ভব বাঙলার লোকমানসে নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকসমাজেই এ-কাহিনীর উদ্ভব। পরবর্তী কালে সে কাহিনী পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাঙলার লোকসমাজে 'কাকভুশণ্ডী' শব্দগুচ্ছের প্রচলন আছে। কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এ-শব্দগুচ্ছ প্রচলিত হত না।

কাকের রঙ কালো হল কেন? ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বিহঙ্গচারণা' [১৯৮৫] গ্রন্থে এ-সম্পর্কে একটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে: 'যমুনার এক পারে মথুরা, আর পারে বৃন্দাবন। অক্রূর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা পরম বিরহে দিনপাত করতে থাকলেন। বিরহে তাঁর দিন আর কাটতে চায় না। এদিকে অনেক দিন শ্যামের কোনো সংবাদ নেই। শ্রীরাধার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কী করেন, কী করেন। সংবাদ এনে দেবার কেউ নেই। অষ্ট প্রহর নয়ন ঝুরে। শেষে শ্রীরাধা তাঁর নয়নের কাজল দিয়ে তৈরি করলেন এক কাক। সেই কাক তাঁর বেদনার দূতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ নিয়ে এল।

শ্রীরাধার নয়ন-কাজল থেকে এমনিভাবেই ধরায় কাকের সৃষ্টি হল। কাকের দেহবর্ণ তাই কাজলের মতো কালো। শ্রীরাধার দূতীগিরি করবার জন্যেই কাকের সৃষ্টি হয়েছিল বলে আজও কাক মানুষকে শুভাশুভ নানা সংবাদ এনে দেয়।' [পৃ. ৬০১]।

কাকের রঙ্ কালো হলো কেন, এ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যাত্মক কাহিনী বিভিন্ন লোকসমাজে দেখা যায়। যেমন, সেমা ও আও-নাগাদের মধ্যে, ছোটনাগপুরের মুণ্ডারীদের মধ্যে। বাঙলার অঞ্চল-বিশেষে প্রচলিত কাহিনীটির সঙ্গে অবশ্য ঐ সমস্ত কাহিনীর কোনো মিল নেই। বস্তুতপক্ষে, কাক শুভাশুভ সংবাদের বাহক এই বিশ্বাস থেকেই পূর্বোক্ত কাহিনীর উদ্ভব। বাঙলার লোকসমাজ

ভাব-বৃন্দাবনের প্রজা। বাঙলার লোকগীতি কানুর কথায় মুখর। কাকের কথাতেও তাই বৃন্দাবনবাসিনী বিরহিণী রাধিকার কথা মনে আসে।

ড. ভৌমিকের উক্ত গ্রন্থে সংকলিত আর একটি কাহিনী : 'একবার বাদুড়ের খুব অসুখ হয়। কাক তখন ছিল বৈদ্য। কাক অনেক ওষুধপত্র দিয়ে বাদুড়কে সারায়। কাক তখন বাদুড়ের কাছে তার পারিশ্রমিক চায়। পারিশ্রমিক কী, না বাদুড়ের দেহের খানিকটা মাংস। বাদুড় সে মাংস দেয়নি। তাই কাকের ভয়ে আজও সে দিনের বেলা বের হয় না। বের হলেই কাক ঠুকরে তার গায়ের মাংস তুলে নেবে।' [পৃ. ৬০৫]। এ-কাহিনীতে কাকের দ্বিবিধ পরিচয়। কাক পরোপকারী ও কাক প্রতিশোধপরায়ণ।

পাঁচ. ধাঁধা-গীতি-গীতকায়

বাঙলার লোকসমাজে প্রচলিত ধাঁধাগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত পরিচিত প্রাত্যহিক জীবন থেকে সংগৃহীত। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সব কিছুই ধাঁধার বিষয়-মর্যাদা লাভ করেনি। ধাঁধার জগতে কাকের আবির্ভাব ক্বচিৎ। উদাহরণ তাই বেশি পাওয়া যায় না। কাক-সম্পর্কিত ধাঁধা :

১. এ পাড়ে আড়ায় কাক
ও পারে আড়ায় কাক
কয় কাক হয় ?[১৯]

উত্তর — দুটি কাক। 'আড়ায়' শব্দের অর্থ 'আড়াতে'। অর্থাৎ উঁচু স্থানে। কিন্তু উচ্চারণে শোনায় 'আড়াই'। ধাঁধাটি বস্তুতপক্ষে সূক্ষ্ম উচ্চারণ-কৌশলের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

২. কোনে সে চরে গুহে-গোবরে,
কোনে ত চরে আমডালো ?

'বাঁধনা' পরবের প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধায় উত্তরটি এভাবে দেওয়া হয়েছে : 'কাওয়া যে চরয়ে গুহে-গোবরে গো, কুইলি যে চরে আমডালো'। প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করে হয়েছে : কে গু-গোবরে চরে কে আমডালো চরে অর্থাৎ বিচরণ করে ? উত্তরে বলা হয়েছে : কাক গু-গোবরে আর কোকিল আমডালে বিচরণ করে।[২০] কাকের সঙ্গে কোকিলের প্রতিতুলনায় এ ধাঁধা রহস্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাহ্যরূপ নয়, স্বভাব-প্রকৃতিই ধাঁধাটির উপজীব্য।

কাক বার্তাবাহক। উত্তরবঙ্গের একটি লোকগীতে শ্বশুর-গৃহে লাঞ্ছিতা এক বধূ কাকের মাধ্যমে তার জননীর কাছে দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার বার্তা পাঠিয়েছে।

বার্তাটি কখন দিতে হবে তাও জানিয়েছে:

'কাগারে, যখন মা মোর সিনান করে
তখন না ক'ন কাগা মায়ের আগে
মরিবে মা মোর দরিয়ায় ঝাম্পো দিয়া।
যখন মা মোর বিছিনাত শোতে
তখন কন কাগা মায়ের আগে
বালিশ ভিজিবে দুই নয়নের জলে।'[২১]

নাথ-গীতিকার 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর 'বুঝান'খণ্ডে ময়নার পরীক্ষাব দিনের প্রভাত-সূচনার বর্ণনায় শ্বেতকাকের আবির্ভাব ঘটেছে:

'রাত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলা করে রাও।
শ্বেতকাক বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও।'[২২]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে 'ভেলুয়া' পালায় রাত্রি-অবসানের বর্ণনায় কাকের উপস্থিতি: 'কাউয়া করে কলরব কোকিলা কুহরে।'

ছয়. লোক-উপমায়

বাঙলার লোকসমাজে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপমাসমূহ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। কাকের দেহ ও দেহের অংশ, স্বভাব-প্রকৃতি, আচরণ ইত্যাদি লোকসমাজে উপমানরূপে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। যেমন, কালোত্ব বোঝাতে 'কাকের মতো কালো'—উপমাটি। 'রাজার মা বিইয়েছেন যে কাগের ছা'—প্রবাদটিতে কাকের মতো কালো সন্তানের কথাই বলা হয়েছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল হল 'কাকচক্ষু' জল। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। অবগাহন স্নান নয়, মাথায় একটু জল ছোঁয়ানো মাত্র, এই হল 'কাকস্নান'। অর্থাৎ, কাকের মতো স্নান। কাকের মতো স্বল্প সজাগ নিদ্রাকে বলে 'কাকনিদ্রা'। আঞ্চলিক প্রয়োগে ঢাকা ও কুমিল্লায় 'কাউয়া ঘুম'; রঙ্পুরে 'কাউয়া নিন্দ্'। মাথার চুল এলোমেলো অবিন্যস্ত থাকলে বলা হয় 'কাকের বাসা' ['কাউয়ার বাসা']। কাকের মতো যে কা-কা করে চীৎকার করে কথা বলে শ্রীহট্টে তাকে বলে 'কাউয়া', আর রঙ্পুব অঞ্চলে 'কাউকাসাং'; জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'কাউয়ার কল'। জীর্ণশীর্ণ মানুষকে খুলনা জেলায় বলে 'কাউয়া-কাউয়া' [কাক-কাক], আর হুগলী জেলায় 'কাগমরুনে'। কারো ঠোঁটে কাকের ঠোঁটের মতো ঘা হলে সেই ঘাকে বাখরগঞ্জ অঞ্চলে বলে 'কাউয়াগালী'। কুমিল্লায় 'কাউয়া ক্যাচাল' বা শ্রীহট্টের 'কাউয়া ক্যাচ-ক্যাচি', হল কাকের মতো তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-ঝাঁটি।

কাকের মতো ব্যস্ততা বোঝাতে শ্রীহট্টে বলা হয় 'কাউয়ামি'। আর কাকের মতো চতুরকে 'কাউয়া সিয়ান'। কাকের মতো অল্পেই যে রাগে, রঙ্পুর অঞ্চলে তাকে বলে 'কাউয়ারাগী'। যে বাড়ির লোকজন কাকের মতো চেঁচায় আর ঝগড়া করে সে বাড়িকে ঢাকা অঞ্চলে বলে 'কাউকা বাড়ি' বা 'কাইকা বাড়ি'। 'কাকবন্ধ্যা' হল কাকের মতো এক প্রসবিনী নারী। কাকী একবার মাত্র প্রসব করে। যে নারীর একবার সন্তান হয়, তাকেই বলে 'কাকবন্ধ্যা'।[২৩]

সাত. কাকপুচ্ছ

কাক বাঙলার লোকসমাজে সমাদরের অতিথি নয়, অবজ্ঞার পাখি। কিন্তু এ-কথাও সত্য, বাঙলার লোকজীবনে এই অবজ্ঞার পাখিটির ভূমিকা কম নয়। এ-পাখি একই সঙ্গে পরিচিত ও রহস্যময়। তাই বাঙলার লোকসাহিত্যের আঙিনাটিও কাকের সহজ স্বচ্ছন্দ বিচরণে ও কলরবে মুখর।

---

১. সরকার যোগীন্দ্রনাথ: 'খুকুমণির ছড়া': শৈব্যা সংস্করণ [১৯৮১]: পৃ. ৪।
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ. ৬৬।
৩. ভট্টাচার্য আশুতোষ: 'বাংলার লোকসাহিত্য': ২য় খণ্ড, [১৯৬৩] পৃ. ৫১৪।
৪—৬. মালদহ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপুষ্পজিৎ রায় সংগৃহীত।
৭. ইজদানী রওশন: 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' [ঢাকা, ১৯৬৮] পৃ. ৭৯।
৮. দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১নং: পৃ. ৪৭।
৯. *On an Aetiological myth about the Indian House Crow:* Quarterly Journal of the mythic Society of Bangalore: Vol. XVII, No. 2, October 1926, p. 143.
১০. দ্রষ্টব্য ৩নং পাদটীকা: পৃ. ৫১৪।
১১. তদেব পৃ. ৫২০।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায় অমলকুমার, 'পৌরাণিকা': ১ম খণ্ড [১৯৭৯]: পৃ. ২৩২।
১৩. ভৌমিক নির্মলেন্দু: 'বাঙলা ছড়াব ভূমিকা', [১৯৭৯], পৃ. ৯২—৯৩।
১৪. 'বরিশালের নবান্ন': 'বঙ্গদর্শন', [মাঘ ১৩২০], পৃ. ৭২৬, [পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত]
১৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থভুক্ত। পৃ. ৯৩।
১৬. আলি সলিম ও আলি লাইক ফতেহ্: সাধারণ পাখি, [নয়াদিল্লি, ১৯৮৫], পৃ. ১২২।
১৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৪।

১৮. দে সুশীলকুমার: 'বাংলা প্রবাদ' [১৯৮৫]। সেন সত্যরঞ্জন: 'প্রবাদ রত্নাকর' [১৯৫০]।

১৯. দ্রষ্টব্য ৩নং পাদটীকা, [৫ম খণ্ড, ১৯৮১], পৃ. ১৩২।

২০. ভৌমিক নির্মলেন্দু: 'বাংলা ধাঁধার ভূমিকা', [১৯৮৮], পৃ. ৭।

২১. ভৌমিক নির্মলেন্দু: 'বিহঙ্গচারণা' [১৯৮৫], পৃ. ১৩১।

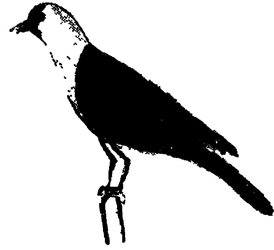
২২. ভট্টাচার্য আশুতোষ সম্পাদিত [৩য় সংস্করণ, ১৯৬৫], পৃ. ৬২।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ: 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' [১ম খণ্ড, ১৯৬৬], পৃ. ৫৮১—৫৮২॥
ও ২১ নং পাদটীকাব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পৃ. ৮৮—৯০।



কাক : লোকসংস্কারে

বরুণকুমার চক্রবর্তী



দেশভেদে কালভেদে সংস্কারে বিভিন্নতা যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি সংস্কারের বৈচিত্র্য এবং এর অবলম্বিত উপাদানগুলিও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। আহার্য, বাসস্থান, পরিচ্ছদ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা, রঙিন স্বপ্ন, ব্যর্থতাজনিত গ্লানি, নৈরাশ্যজনিত বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সর্বকালীন মানুষের মধ্যে একপ্রকার ঐক্যের সন্ধান যেমন পাই, তেমনি সংস্কারের জগতেও বিশ্বমানবের ঐক্যের সন্ধান লভ্য। অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা যেখানে, সেখানেই কমবেশি সংস্কারের আধিপত্য। নিছক নিরক্ষর কিংবা অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গেই সংস্কারের সম্পর্ক, এই ধারণা যথার্থ নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে, এশিয়া-ইউরোপে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিংবা সাদা চামড়া, কালো চামড়া নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রান্তের রক্তমাংসের মানুষই কম-বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিও এক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমরা বর্তমান নিবন্ধে সংস্কারের জগতে কাকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। কিন্তু তৎপূর্বে কাকভিত্তিক কিছু প্রচলিত সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমে বাঙলা দেশে প্রচলিত কিছু সংস্কার উল্লেখিত হল :

১. রাত্রে কাকের ডাক অমঙ্গলজনক।

২. দুপুরবেলায় বাড়ির চালের ওপর কাক ডাকলে অশুভ সংবাদ আসে।

৩. দাঁড়কাক ডাকলে ক্ষতি হয়।

৪. শূন্য কলসী, শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা।'

৫. বাড়ির সংলগ্ন অংশে যদি দুটি কাককে নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাড়িতে অতিথি সমাগম ঘটবে।

৬. কাকেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করলে অতিথির আগমন সূচিত হয়।

৭. কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা। ঐ ক্ষেত্রে মামার বাড়ির ভাত খেয়ে দোষ স্খালন করতে হয়।

৮. প্রত্যুষে কাকের ক্রমাগত ডাক, প্রবাস থেকে কারো আগমনকে সূচিত করে।

৯. 'শুকনো কাঠে রটে কাউ ভান্তি দাপুনি, দেখে লাউ।
যোগী আদ্য ছুছু কলসি তা দেখিলে না ঘরে আসি।'

অর্থাৎ, শুষ্ক কাঠে উপবিষ্ট কাক দর্শন, লাউয়ের অর্ধাংশ, শূন্য কলস ইত্যাদি যাত্রাকালে দেখা খারাপ।

১০. কেউ যদি সকালে বাঁ দিকে কোন কাককে ডাকতে শোনে, তাহলে তার পক্ষে তা খুবই অশুভ বলে মনে করা হয়।

১১. বাড়িব সামনে কাক একটানা ডাকলে বলা হয় কোন দুঃসংবাদ আসন্ন।

১২. বাড়ির মধ্যে একত্রে অনেক কাকের ডাক কুলক্ষণের ইঙ্গিতবাহী।

১৩. নিকটবর্তী হয়ে কাক ডাকলে বাড়িতে অতিথির আগমন সূচিত হয়।

এইবার আফ্রিকা ও ইউরোপে প্রচলিত কয়েকটি সংস্কার উল্লেখিত হচ্ছে:

১৪. যদি একটি কাক কোনো বাড়ির কাছে ডাকে, তাহলে বুঝতে হবে ঐ অঞ্চলে কারো মৃত্যু হবে।

১৫. এক ঝাঁক কাককে যদি একটি গাছ থেকে একই সঙ্গে উড়তে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোন দুঃসংবাদ আসবে, বিশেষত দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস রূপে তা বিবেচিত হয়।

১৬. সকালে যদি সূর্যের দিকে কাকেদের উড়তে দেখা যায়, তবে আবহাওয়া হবে সুন্দর ও শুষ্ক।

কাক সংক্রান্ত সংস্কারে কাকের সংখ্যাও বিশেষ রূপে বিবেচিত হয়। আমেরিকার Mary Land-এ এতদ্‌সম্পর্কিত ছড়াটি হল:

One crow—sorrow
Two crows—mirth
Three crows—wedding
Four crows—birth

অর্থাৎ, একটি কাক—দুঃখ আনে।
দুটি কাক—আনন্দ আনে।

তিনটি কাক — বিবাহ অনিবার্য করে তোলে।
চারটি কাক — সন্তান-জন্মের ইঙ্গিতবাহী।

১৭. একটি কাককে যদি কোন দণ্ডে বা দাঁড়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়, তবে তা দুর্ভাগ্যের সূচক।

১৮. যদি এক ঝাঁক কাককে নিশাগমে জলাশয়ের কাছে দেখা যায়, তবে তা তীর থেকে দৃশ্যমান সমুদ্রে ঝড়ের দ্যোতক।

১৯. যদি একটি কাক অসম সংখ্যায় ডাকে, তবে তা আবহাওয়া খারাপ হওয়ার পূর্বাভাস ; বিপরীতক্রমে যদি সমসংখ্যায় ডাকে, তবে আবহাওয়া ভাল হওয়ার পূর্বাভাস রূপে তা বিবেচিত হয়।

২০. যদি কাকের দল সকালে ভিড় জমায় এবং সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, তবে উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া দেখা যাবে, যদি নিশাগমে, তাদের সতর্কতার সঙ্গে জলাশয়ের দিকে যেতে দেখা যায়, তবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

২১. জানলার কাছে যদি কোনো কাক ডাকে এবং পক্ষ সঞ্চালন করে, তবে ঐ গৃহে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা।

২২. একটি কাক যদি একটি বাড়ির ওপরে তিনবার ওড়ে এবং তিনবার ডাকে, তবে তা দুঃসংবাদ বহন করে আনে, ঐ গৃহের কারোর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

২৩. একটি কাককে একাকী উড়তে দেখলে তা দুর্ভাগ্য বহন করে আনে।

২৪. প্রত্যক্ষদর্শীর পথে যদি কোনো বৃদ্ধ কাককে ডালে বসা অবস্থায় দেখা যায়, তবে তা গভীর ক্রোধ বা রাগের সূচক।

২৫. কাকেরা যখন কর্কশ স্বরে বা শ্রুতিকটু ভাবে ডাকে, বুঝতে হবে মন্দ আবহাওয়া দেখা দেবে।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, আবহাওয়া সংক্রান্ত সংস্কারের সঙ্গে কাকের গভীর সম্পর্ক, অতিথির আগমন সংক্রান্ত সংস্কারেও কাকের ভূমিকা, মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কারে কাকের স্থান আছে, কাক স্থান পেয়েছে অশুভ ইঙ্গিত প্রদানের ক্ষেত্রেও। মূলত দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতবাহী রূপেই কাককে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশ্য, আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারে আবহাওয়ার সঙ্গে কাকের সম্পর্ক লক্ষিত হয় না তেমন, সেটি লক্ষিত হয়

বিদেশে, কাকের সংখ্যা, কাকের ডাক, কাকের উপস্থিতির সময়, কাকের উড়ন্ত অথবা উপবিষ্ট অবস্থা ইত্যাদিকেই সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমরা জানি, সংস্কার গড়ে উঠেছে নানা উপাদান, জীব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। পাখিও সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে, তাই বলে সব পাখিই নির্বিচারে সংস্কারের জগৎ নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়নি। কোকিল, পেঁচা, ময়ূর, শকুন ইত্যাদি বিশেষ ধরনের কয়েকটি পাখিরই সংস্কারের জগতে রাজকীয় আধিপত্য। আধিপত্য কাকেরও। এই আধিপত্য সে অর্জন করল কি করে, তাই বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।

পাখিদের সংস্কারে কাক শুধু কুৎসিত দর্শন প্রাণীই নয়, তার কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ, তেমনি তার নির্বুদ্ধিতা এবং মানুষের সামান্য অসতর্কতায় সে ক্ষতি সাধনে পটু। তাই কাককে মানুষ সুনজরে দেখেনি, দেখে না। এই সুনজরে না দেখার আরও একটি কারণ হল, সংখ্যার দিক দিয়ে কাকের প্রাচুর্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কাক সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। কাককে বিবেচনা করা হয়ে এসেছে দুর্ভাগ্যের সূচকরূপে, মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী রূপে। যাদুবিদ্যার সঙ্গেও কাককে যুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতাসম্পন্ন বলেও কাক কল্পিত। রাশিয়ায় ডাইনীর সত্তা কাকের রূপ ধারণ করে বলে বিশ্বাস। প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করত, কাকের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভক্ষণ করলে ভবিষ্যৎবাণী করার অধিকার জন্মে। কাকের সঙ্গে অশুভকে যুক্ত করে দেখার যে মানসিকতা, তার মূলে রয়েছে কাকের কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণকে অন্ধকারের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে অনুমান করা হয়। ঐতিহ্য-পরম্পরায় লাল, সাদা, এবং নীল বর্ণকে শুভ ও আনন্দসূচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, বিপরীতক্রমে কালো, হলদে, কমলা এবং বেগুনে রঙকে অশুভ ও দুর্ভাগ্যের সূচক বলে গণ্য করা হয়ে এসেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণবর্ণকে মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়ে এসেছে। মৃত্যুজনিত ঘটনায় কৃষ্ণবর্ণের পোশাক পরিধান করা রীতি। এটি রোমানদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থেই যে কৃষ্ণবর্ণের পোশাক পরিধান করা হয়ে থাকে, তা নয়, আসলে মৃত্যুর উপস্থিতিতে আমরা যে কত অসহায়, আমরা কত দুর্বল ও ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন, তাই স্বীকার করা হয় এই ভাবে।

নবান্ন তৈরি করে কাককে খাওয়ানোর রীতি আছে। এমনকি পিতৃপুরুষের জন্য প্রস্তুত পিণ্ড কাককে খাওয়ানো হয়, খাওয়ানো হয় সরায় করে রাখা

দুগ্ধ ও গঙ্গাজল। বিশ্বাস, কাক পিণ্ডদানের কথা যমরাজকে জানিয়ে দেবে। আর কেউ কেউ মনে করেন, মৃত পিতৃপুরুষেরা বিভিন্ন পশুপাখি, সরীসৃপের ছদ্মাবরণে তাঁদের নিজগৃহে আসেন। তাঁদের অন্ন দিয়ে আশীর্বাদ কামনা হল এর উদ্দেশ্য। কাক, সর্প, শৃগাল প্রভৃতি এজাতীয় জীব যাঁদের রূপ ধরে তাঁরা আসেন।

অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় পাখিদের ওপর কিছু অতিরিক্ত শক্তি ও বিশ্বাস আরোপ করতে দেখা যায়, আর এইভাবে দেখার রীতি সুপ্রাচীন। মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে, পাখিরা যেহেতু আকাশে ওড়ে তাই সেই সুবাদে তারা আকাশের অলৌকিক ক্ষমতা, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ক্ষমতা, আবহাওয়ার ক্ষমতা, সর্বোপরি যে-সব দেবদেবী ঊর্ধ্বলোকের বাসিন্দা, তাদের যেমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা শুভাশুভের ইঙ্গিতদানের ক্ষেত্রেও তারা অত্যন্ত সফল। এমনকি পাখির অবয়বে পূর্বোক্ত ক্ষমতাগুলি আত্মপ্রকাশ করে বলেও বিশ্বাস রয়েছে। মানুষকে বাদ দিলে বাক্‌শক্তিতে পাখিই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। পাখিদের কলকাকলির বৈচিত্র্যও সীমাহীন। আর সেই কারণেই পাখিদের ডাকও বিশেষ অর্থবহ বলে মনে করা হতে থাকে। 'Their calls and songs constitute a language of signals, limited but efficient.

আমাদের লোককথাগুলিতে সর্বশক্তিসম্পন্ন পাখির কোন অভাব নেই। 'Talking bird' তো খুবই পরিচিত এক মটিফ। শুক-সারিকে প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা গেছে লোকসাহিত্যের রাজ্যে। সকল সময়ে পাখির ভাষা বোধগম্য না হলেও, সময় বিশেষে মানুষ পাখির ভাষা দিব্যি বুঝতে পারে। 'Talking bird'-এর মত "The bird of truth' মটিফও খুবই পরিচিত এক মটিফ। এই মটিফের তাৎপর্য হল পাখি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতা রাখে, যেমন বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় পাখি জানিয়ে দেয়। এ-সবের কারণেই পাখি দৈববাণীর মতই ঘটনার পূর্বেই সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দানের অধিকারী বলে কল্পিত হয়েছে। কাক যেহেতু পাখি, তাই তার ক্ষেত্রে স্বভাবতই পূর্বোক্ত ক্ষমতাগুলি আরোপিত হয়েছে। কাককেও ঈশ্বরের ডানা সম্বলিত মুখপাত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে। কাকের যে দুনাম কিংবা অশুভ ইঙ্গিতবাহী রূপে তার যে কুখ্যাতি, তার সূত্র দাঁড়কাক —একথা পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন: 'The bad name of the crow, however, was originally inherited from

the ravens, which as the symbol of doom was displayed on the banners of the wild Norse invaders of these lands.'

লক্ষণীয় লোকসংস্কৃতির জগতে কাককে দীর্ঘজীবী বলে কল্পনা করা হয়েছে। এইবার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কাককে অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতবাহী বা কারণ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, উপস্থাপন করা হয়েছে যাদুকরী শক্তির বলিষ্ঠ উপাদান রূপেও। বলা হয়, 'cicero'-র যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন তার মস্তকোপরি কয়েকটি কাক পক্ষ সঞ্চালন করেছিল। Ovid তাঁর 'Metamorphoses'-এ উল্লেখ করেছেন, বৃদ্ধ Acson-কে যৌবন ফিরিয়ে দিতে তার শিরায় একটি দীর্ঘজীবী হরিণের যকৃতের ক্বাথ এবং কাকের মস্তক অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। পরিণামে মানুষের নয়টি প্রজন্ম দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে। প্রাচীন ইংলণ্ডে রোমান উপনিবেশের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত পক্ষী সংক্রান্ত সংস্কারের তেমন হদিশ মেলে না। Northampton-এর Defensative-এ [১৮৫৩] উল্লেখ পাই রোমানদের শিবিরের বামপার্শ্বে অসংখ্য কাকের ওড়া, রোমানদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। রোমানদের কাছে বাঁদিক সর্বদাই অশুভ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে: The flight of many crows over the left side of the camp, made the Romans very much afraid of some bad luck.' স্কটিশ ব্যালাড *The Twa Corbies a Person*-এ উল্লেখিত হয়েছে কাকদের এক মৃত নাইটের দেহের উপর তাদের ভয়ঙ্কর ভোজন নিয়ে আলোচনা কথা।

Pliny মারা গেছেন ৭৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি লিখে গেছেন: 'These birds, crows and rooks, all of them keep prattling and are full of chat which most men take for an unlucky signe and presage of ill fortune.'

একটি প্রাচীন ভারতীয় যাদুবিদ্যার গ্রন্থ হল 'কৌশিক সূত্র'। এতে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি অভিনব পথ নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে একটি কাকের বাম পায়ে একটি বড়শি বা আঁকশি যুক্ত করে দিতে হবে, আর তাতে বেঁধে দিতে হবে যষ্ঠীয় পিঠাকে। কাকটিকে এমন ভাবে উড়িয়ে দিতে হবে, যাতে সে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখী হয়। যখন তাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন পুরোহিত 'বাওঝা' মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকবেন। আমাদের দুর্ভাগ্যেরও আর শেষ নেই, আর

কাকের সংখ্যাও সৌভাগ্যবশত অপ্রতুল নয়; অতএব 'কৌশিক সূত্র'-এর নির্দেশ মেনে সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে লাভ করার চেষ্টা করা যেতে পারে, অন্তত চেষ্টায় তো ক্ষতি নেই, তাই নয়?

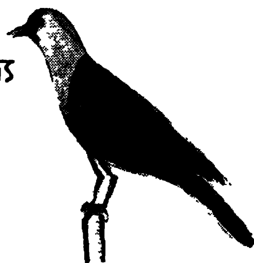
সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. *A Dictionary of Omens and Superstitions* [London, 1977]: Philippa Warning.
২. *Encyclopaedia of Superstitions* [London, 1947]: E. and M.A. Redford.
৩. *Encyclopaedia of Magic and Superstition.*
৪. *Supersition and the Supersitions* [London; 1971]: Erie Maple.
৫. 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' [৩য় সং, ১৯৯৫]: বরুণকুমার চক্রবর্তী।
৬. লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ [১৯৯৭]: ড. মোমেন চৌধুরী।



কাক : পুরাতন বাঙলা সাহিত্যে

সত্যবতী গিরি



সুকুমার রায়ের 'দ্রিঘাংচু'-র কথা জানেন না—এমন কোনো সাক্ষর বাঙালি আছেন কি? অন্যদিকে কথামালার সেই বুদ্ধিমান কাক, তেষ্টা মেটাতে যে কলসিতে পাথর ফেলে তলার জল ওপরে এনেছিল। পঞ্চতন্ত্রের 'মৃগ-কাক-শৃগাল-কথা'য় হরিণের বন্ধু সেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কাক তো স্মরণীয় একটি চরিত্র। এই কাকই আবার একবার শাবকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাজকন্যার হার এনে ফেলেছিল নিজের বাসায়।

কিন্তু এসব গল্পেরও আগে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে নানাভাবে কাকের উল্লেখ আছে। 'কই' ধাতু থেকে 'কাক' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, কাকের ডাকের অর্থে ধাতুটির ব্যবহার। ঋগ্বেদ, মহাভারত, অদ্ভুত ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতেও কাকের উল্লেখ আছে।

তবে পাণিনি কেন যে কাককে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করেছিলেন জানি না। [ন ত্বং কাকং মন্যে': তোমাকে কাকও মনে করি না]।[১]

পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও কাক সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই লক্ষ্য করা যায়। 'বৃহৎ পরাশর স্মৃতি'তে একদিকে কাককে শস্যনষ্টকারী ও অন্যদিকে অপবিত্র বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের 'হলচ্ছিদ্রকরণ বিধি' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'খামারের পূর্বদিকে অত্যন্ত ঘন করিয়া বেড়া দিবে। সকল দিকে সেচন দ্বার ও আচ্ছাদন দিবে। গর্দভ, উষ্ট্র, অজ, মেষ, কুক্কুর, শুকর, শৃগালাদি জন্তু, কাক, পেচক ও কপোত—ইহাদের সেখানে প্রবেশ নিবারণ করিবে।'[২] অষ্টম অধ্যায়ের 'শুদ্ধি-বর্ণনম্' অংশে বলা হয়েছে যে রজস্বলা স্ত্রীলোক যদি কুকুর, বৈশ্য, শূদ্র ও বায়সের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়—তবে স্নান করা পর্যন্ত অনাহারে থেকে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করে শুদ্ধ হবে।'[৩]

'বিষ্ণুসংহিতা'র ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কাককে অপবিত্র বলা হয়েছে।[৪] এই গ্রন্থেরই ৫১তম অধ্যায়ে ৪৬ সংখ্যক শ্লোকেও বিড়াল, কাক, নকুল ও ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেলে ব্রাহ্মী শাকের কাথ খেয়ে নিজেকে শুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ১০৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে প্রথমে মানুষের প্রীতির জন্য অন্ন দিয়ে তারপর যথাশক্তি কুকুর, চণ্ডাল, এবং কাক পক্ষীকেও ওই অন্ন ভূমিতে দিতে হবে।[৫] এই সংহিতারই তৃতীয় অধ্যায়ে ২১৪ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দুগ্ধহরণ করে—যে কাক হয়ে জন্মায়। বাঙালি স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দনও কাককে অমঙ্গলসূচক পাখিই বলেছেন।

কিন্তু অবজ্ঞা এবং ঘৃণা পাওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো সংহিতায় কাককে হত্যা করা প্রায়শ্চিত্তযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন সংবর্তসংহিতায় বলা হয়েছে হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, সারস এবং ভাস—এইসব পাখি হত্যা করলে তিনদিন উপবাস দ্বারা যাপন করতে হবে।[৬] পরাশরসংহিতায়ও বলা হয়েছে, 'ভাস-কাক-কপোতানাং সারী তিত্তিরিঘাতকঃ। / অন্তর্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।।' ['ভাস-কাক-কপোত, সারী ও তিত্তিরী বিনাশ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে]।'[৭]

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'তে এক অজ্ঞাতনামা কবি কোকিলের পরিবর্তে কাককে বলি অর্থাৎ ভোজ্য দানের কথা বলেছেন।[৮] এছাড়াও সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহবীচয়ঃ-র 'প্রোষিতভর্তৃকা- প্রিয়সংবাদঃ' অংশে ৬টি শ্লোকে কাকের প্রসঙ্গ আছে। এর মধ্যে একটি শ্লোকে পিণ্ড ভক্ষণকারী কাকের জীবন্ত ছবি আঁকা হয়েছে:

'দত্তং পিণ্ডং নয়নসলিলক্ষানাধৌতগণ্ডং
দ্বারোপান্তে গতদয়িতয়া সঙ্গমান্বেষণায়।
বক্রগ্রীবশ্চলনতশিরাঃ পার্শ্বসঞ্চারিনেত্রঃ
পাশাশঙ্কী গলিতবলয়াক্রান্তমশ্নাতি কাকঃ।।'[৯]

দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সাহিত্যের একেবারে অর্বাচীন কাল পর্যন্ত নানা ভাবে নানা জায়গায় কাকের প্রসঙ্গ এসে গেছে।

মহাকবি কালিদাস কিন্তু তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যের পূর্বমেঘে স্নিগ্ধসুন্দর গ্রাম বর্ণনায় কাককে গ্রামের স্বাভাবিক সমগ্রতায় অশুভ বলে উপস্থাপিত করেননি। বরং কাকের উপস্থিতিই তাঁর গ্রামবর্ণনাকে বিশেষভাবে সজীব ও সৌন্দর্যময় করে তুলেছে:

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজমাকুলগ্রামচৈত্যাঃ

ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূ বনান্তঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।[১০]

কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায়েরও কাক সম্পর্কে ধারণা আলাদা রকমের। যেমন—মুণ্ডা জাতিব পূর্বপুরুষেদের কাছে শকুন, ডোমচিল, কাক ইত্যাদি পাখিরা শত্রু বলে বিবেচিত হয়নি—বরং তাদের পরম কল্যাণকারী বন্ধু বলেই মনে করা হতো। পৃথিবীর অন্যত্রও আদিবাসীদের মধ্যে একই ধারণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—আমেরিকার মিনোমিনি জাতির মধ্যে ঈগল, বাজপাখি, কাক এবং দাঁড়কাক টোটেম হিসাবে পরিচিত।[১১]

সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রচলিত সূর্য, চন্দ্র, শকুন, চিল, বাজপাখি, হাঁস, উঁচু পাহাড, কাক ইত্যাদি টোটেম পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাঁওতাল জাতির পূর্বপুরুষেরা সূর্য-চন্দ্রের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে শকুনকে ধরেছেন। শকুনের সঙ্গে উঁচু পাহাড়ের চুড়ো আর বাজপাখির সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক আছে। আর মানুষের বাসগৃহের কাছাকাছি বাস করে চিল ও কাক। শকুন আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়ায় বলে মানুষের পল্লির আশেপাশে পড়ে থাকা মৃত জীবজন্তুর শব প্রথমেই দেখতে পায় না—চিল, কাক, শেয়াল, কুকুরের গতিবিধি লক্ষ্য করেই শকুন নিচে নেমে আসে। মৃত জীবজন্তুর মাংস খেয়ে এই সমস্ত পশুপাখিরা আদিম মানুষের পরম বন্ধুর কাজ করতো। সেই কারণেই এরা 'টোটেম' বা 'কুলকেতু' হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

এবার বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকানো যাক। চর্যাপদে একবার হলেও কাকের উল্লেখ আছে। কোনো এক গৃহস্থ বধূ দিনের বেলাই কাকের ডাকে ভয় পায়—অথচ রাত্রে কামরূপিনী হয়ে বিহার করে।[১২] কাক অশুভ পাখি—কাকের ডাকে অমঙ্গল হয়—এই বোধ থেকেই হয়তো এই ধরনের ভীতি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও কাককে যাত্রার পক্ষে অমঙ্গলজনক অশুভ পাখি বলা হয়েছে। কাক এখানেও কোনো চরিত্র নয়, লোকসংস্কারে যাত্রার শুভাশুভ নির্ধারণকারী একটি পাখি। এই কাব্যের একাধিক জায়গাতেই কাককে যাত্রার পক্ষে অশুভ বলা হয়েছে। একটি উদাহরণ অন্তত এক্ষেত্রে দেওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি হারিয়ে যাওয়ার পর তিনি অভিযোগ করেছেন যে রাধাই তাঁর বাঁশি চুরি করেছে। উত্তরে রাধা বলেছে যে তার আজকের যাত্রা শুভ ছিল না বলেই তাকে এই দুর্নাম পেতে হচ্ছে। পথে বেরোনোর সময় সে

নানা দুর্লক্ষণ দেখেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল—'সুখান ডালেতে বসি কাক কাঢ়ে রাএ।'[১৩] সমকালীন সমাজের লোকসংস্কারই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙলা প্রবাদের মধ্যেও এই পরিচিত কালো পাখি একটা জায়গা করে নিয়েছে। সেই প্রবাদেরই ব্যবহার দেখা যায় ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে। কালুর বাঁটুলে আহত পাখি লাউসেনের কোলে গিয়ে পড়েছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে লাউসেন রঘুরাজার শরণাগতকে রক্ষা করার পৌরাণিক কাহিনী বলেছেন। কিন্তু কালু বলেছে—পুরাণের দোহাই দিলেও সে এসব কিছুই বোঝে না। তার মতে:

'বনের বানর ভক্ষএ পত্রফল
সে জানে কেমন ঘি।
বৃক্ষের উপর পাকিল শ্রীফল
কাকের বাপের কি?'[১৪]

রূপরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যে রামায়ণের একটি প্রসঙ্গে কাকের কথা বলা হয়েছে। মরুত্তরাজার যজ্ঞে যম রাবণের ভয়ে কাকরূপ ধারণ করে পালিয়ে যান। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ১৮শ সর্গে এর উল্লেখ আছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আখড়া পালায় এর বর্ণনা পাচ্ছি—'কাকরূপে যমরাজা গেল দিগন্তর।'[১৫] এই ধরনের আর একটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে 'গোর্খ বিজয়ে': 'মাকালের ফলটি দেখে কাকের আণুমতি।'[১৬]

কাকপ্রসঙ্গ অন্যভাবে পাচ্ছি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলোতে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও সপত্নী বশীকরণের জন্য ঔষধ তৈরির অন্যতম উপাদান হিসেবে 'শ্বেতকাকের শোণিত'-এর কথা বলা হয়েছে।'[১৭] দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলেও সপত্নী-বশীকরণের ঔষধ তৈরির জন্য 'কাউয়ার জিব্বা' [কাকের জিভের] কথা বলা হয়েছে।'[১৮]

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'দেওয়ানা মদিনা' পালাতে দেখা যায় দুলাল নিজের ভুল বুঝতে পেরে মদিনার কাছে ফিরে যাওয়ার সময় যে সমস্ত অশুভ চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছে—তার মধ্যে 'মাথার উপর ডাকে কাউয়া'[১৯]-ও আছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার রতন ঠাকুকের পালায়ও শুকনো ডালে কাক অশুভ লক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়েছে।'[২০]

কাকের কর্কশ ডাক দুঃসংবাদ বয়ে আনে, অথবা বেশি রাত্রে কাকের ডাক অমঙ্গলজনক, মৃত্যুরই পূর্ব-ঘোষণা মনে করা হয়। বাড়ির আশেপাশে কাকেব দল যদি ঘোরাফেরা করে—তাহলে তাকেও অমঙ্গল চিহ্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু কাকের কোনো বিশেষ ধরনের ডাক আবার শুভ বলে মনে করা হয়। কারণ তাতে নাকি বাড়িতে অতিথি বা প্রিয়জন আসে। এই লোকবিশ্বাসেরই প্রতিফলন দেখা যায় জ্ঞানদাসের একটি ভাবোল্লাসের পদে :

'আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে উড়িয়া বৈঠল ঠায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দিরে আওব
কপালি কহিয়া গেল।'[২১]

মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাঙলাদেশের পরিচিত পাখিদের তালিকা দিতে গিয়ে কবিরা তাঁদের তালিকায় কাকের নামও রেখেছেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যের 'আখড়া পালা'য় রাজহংস সারী-শুকেব সঙ্গে 'কাক কঙ্ক কোকিল করিছে কলরব'। 'সুরিক্ষা পালা'তে প্রভাতের সূচক হচ্ছে কাকের ডাক—'কাক ডাকে পূর্বে প্রকাশ বেলি। / গা তুলিল সেন গণ্ডুষ ফেলি॥'[২২]

এই ভাবে টুকরো টুকরো প্রসঙ্গে কাকের উল্লেখ বেশ কিছু পরিমাণেই আমরা পেলাম। বলা বাহুল্য, অনুসন্ধানে তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের টুকরো প্রসঙ্গ ছাড়াও একটি পূর্ণাঙ্গ কাকের উপাখ্যান আমরা পাই বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যের শ্বেতকাকের উপাখ্যানে। শ্বেতকাকের গল্প মনসামঙ্গলের কাহিনীতে যেন আর একটা নতুন তাৎপর্য এনে দেয়। এক সদ্যোবিবাহিতা স্বামীহারা বালিকার শোকদীর্ণ হৃদয়ের বেদনা আর মৃত্যুকে জয় করার সংকল্পে শ্বেতকাকের উপাখ্যানের সংযোজন জীবনসত্যের এক নবতর উদ্ভাসন ঘটায়। বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যের কবিবা এই কাহিনীকে নিজেদের মতো করে রূপ দিয়েছেন।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয় একটি প্রাচীন পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গল। তাঁর কাব্যে শ্বেতকাকের প্রসঙ্গ উপস্থাপনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। মৃত লখিন্দরের শব নিয়ে বেহুলা ভেসে যাচ্ছে। মনসা সাদা কাকের ছদ্মবেশে এসে :

'ডাকি বলে বেহুলায
একাকী মাজষে ভাসো কেণি।'[২৩]

বেহুলা কাককে তাব দুঃখের কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে জননী সুমিত্রার কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের ও দুর্গম পথযাত্রার সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু শ্বেতকাক বলে :

'ডিম্ব ফুটাইএছি কালি
ক্ষুধা অতি হএছে বিকল
লোচন মেলিতে নাবি বাসা যাছে একেশ্বরী
চাব হেতু আইনু কেবল।'[২৪]

বেহুলা কাককে নিজের বতনঅঙ্গুবি অভিজ্ঞান হিসেবে দিযে তার মায়ের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে, সেই সঙ্গে কাককে অর্থেব লোভও দেখিয়েছে। ছদ্মবেশিনী মনসা এখানে ক্ষুধার্ত সন্তানেব জননী হিসেবে নিজেব পবিচয় দিয়েছেন। তাই যেন আব এক দুখিনী মায়েব কাছে হতভাগ্য সন্তানের দুঃখের বার্তা নিয়ে গেছেন তিনি। মনসাব তথাকথিত ক্রূর দৈবীসত্তায় এ যেন এক কোমলতার প্রলেপ।

নাবায়ণদেবের মনসামঙ্গল কাহিনীতে কাক প্রসঙ্গ একেবারেই আলাদা ধরনের। এখানে মনসা নেতাকে শকুনরূপে, আর নাগদেব কাকরূপে বেহুলার যাত্রায় বাধা সৃষ্টির জন্য যেতে বলেছেন। কাক এখানে শ্বেতকাকও নয়। কুটিলা মনসার নিষ্ঠুর ছলনা আব চক্রান্তেবই একটি ভয়াল দিকেব পবিচয় এখানে আছে; বিপ্রদাসেব মতো মানুষেব কোমল প্রবৃত্তি-নির্ভর সুন্দর একটি কাহিনীতে এ-পবিণত হয়নি। এখানে মনসা নেতাকে আদেশ দিয়েছেন :

'কাক সকুন হউক হউক জত সব নাগে।
গিধিনি রূপ ধরি তুমি জাইও আগে॥'[২৫]

পদ্মার আদেশে নেতা শকুনি ও অন্যান্য নাগেরা কাকের রূপ ধবে বেহুলার মৃত পতির মাংস ভক্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু বেহুলা ধর্মের দোহাই দেওয়ায় তারা চলে গেছে। এই কাব্যে কাকের প্রসঙ্গে শুধু বেহুলাকে পরীক্ষাই করা হয়েছে। বিপ্রদাস অন্তত এই প্রসঙ্গটির পরিবেষণে নারায়ণদেবের তুলনায় অনেকে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকের কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে আবার আমরা শ্বেতকাকের কাহিনী পাই। এই কাহিনীর সঙ্গে বিপ্রদাসের

কাহিনীর সাদৃশ্য যেমন আছে—তেমনি আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। যেমন—বিপ্রদাসের কাহিনীতে মনসা নিজেই শ্বেতকাক। কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাহিনীতে মনসার আদেশে নেতাই শ্বেতকাকের রূপ ধারণ করেছে। অন্তরীক্ষে থেকে পদ্মা বেহুলাকে বলেছেন কাকের কাছে কোনো নিদর্শন দিতে। বেহুলা তাকে 'মাণিক্য দোসরি' দিয়েছেন। সমুদ্রে ভেসে যাওয়া শুকনো কেয়াপাতা তুলে চোখের কাজল দিয়ে বেহুলা মায়ের কাছে চিঠি লিখেছেন। তারপর :

'বাপের ঘরে যে অঙ্গুরি পাইল যৌতুক।
পত্রে বান্দিয়া দিল কাকের সম্মুখ॥'[২৬]

কাকরূপিণী নেতাও :

'বেউলার পত্র তুলিয়া লইলেক ঠোঁটে॥
বেউলার বচনে কাকের হয়ে জোড়া।
বায়ুরূপে উঠিয়া আকাশে কবে উড়া॥
দেখিতে না দেখে কাক ঘন পক্ষে উড়ে।
আঁখির নিমিষে গিয়া উজানিতে পড়ে॥'[২৭]

বেহুলার জননী সুমিত্রা কাকের ডাকে গোপাল স্মরণ করলেন। সুমিত্রা কাককে ঘি মাখিয়ে ভাত দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বেহুলা-লখাইর কুশল জানাতে বললেন :

'যদি লখাই থাকে শুভে উড়িয়া পড়িবে পূবে
অকুশলে পড়িবা দক্ষিণে'।

সুমিত্রার কথা শুনে কাক 'দক্ষিণে পড়িল অকস্মাৎ'[২৮] এবং ঠোঁট থেকে পত্র ও অঙ্গুরীয় মাটিতে রাখলো।

লক্ষণীয় বিপ্রদাসের কাক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে। তার সন্তান-স্নেহের প্রকাশ ও মানুষের সঙ্গে কথা বলাতেই তার পরিচয়। গোটা ব্যাপারটার পরিকল্পনা মনসার হলেও এবং মনসা নিজেই কাক হলেও, বেহুলার কাছে তা অজ্ঞাত। কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাহিনীতে বেহুলা মায়ের কাছে খবর পাঠানোর জন্য মনসার কাছেই আবেদন জানিয়েছে। আর মনসারই নির্দেশে কাকরূপিণী নেতার সাহায্যে খবর পাঠিয়েছে। এখানে বেহুলা জানে সে দেবতার সাহায্যপুষ্ট। এর ফলে কাহিনীর কারুণ্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখানে কাকের আচরণও কাকেরই মতো। সে মানুষের সঙ্গে কথা বলে না। পত্র আর অঙ্গুরীয় নিয়ে চলে আসে।

উত্তরবঙ্গের কবি তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলটি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। এঁর কাব্যেও শ্বেতকাকের কাহিনীটি আছে। কাহিনীটি বিপ্রদাসের অনুরূপ। শ্বেতকাকরূপিণী মনসাকে বেহুলা মাণিক্য অঙ্গুরি নিয়ে উজানি নগরে যেতে অনুরোধ করলে সে বলেছে:

'উজানি নগরে আমি জাইতে না পারি'—

কারণ, তার:

'ডিম্ব হৈতে ফুটে ছাও তিন দিন হৈল।
চক্ষু নাই পাখা নাই তোমাকে কহিল॥
আহার জোগাবে আর কেহ মোর নাই।
এই সে কারণে আমি জাইতে না পাই।'[৩১]

বেহুলা কাককে বলেছে দেবী মনসাকে স্মরণে করলেই সে তার সন্তানদের জন্য ক্ষুধার অন্ন পেয়ে যাবে। এটি তন্ত্রবিভূতির নিজস্ব। তবে বিপ্রদাসের বেহুলা ধনরত্নের লোভ দেখিয়েই কাককে পাঠিয়েছে—এখানেও তাই। এখানে পত্রের কোনো প্রসঙ্গ নেই। কাক নিজেই বেহুলার কথা তার মাকে জানিয়েছে।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যেও মনসাই শ্বেতকাকের বেশে এসেছেন। বেহুলা তাঁকে বাপেরবাড়ি গিয়ে সংবাদ দিতে বললে কাক বলে: 'তথায় মনুষ্য ভাষা কেমনে কহিব'। এখানেও বেহুলা কাককে লোভ দেখিয়ে বলেছে:

'সুবর্ণে বান্ধাব ঠোঁটে রূপা দিয়া পাখ।
আমার বাপের দেশে চল শ্বেতকাক।
প্রাণনাথ কোলে লয়্যা জলে ভাস্যা যাই।
কহিঅ মা এর তরে আর দেখা নাই'।[৩১]

শ্বেতকাক বেহুলার মা অমলার কাছে গিয়ে লখিন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার ভেলায় মৃতপতি সহ ভেসে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছে।

কবি বিষ্ণুপালের কাব্যে শ্বেতকাকের প্রসঙ্গের আগেও আমরা কাকের প্রসঙ্গ পাচ্ছি অন্যভাবে। কবি লখিন্দরের মৃত্যুর পর কোকিলের নিন্দা করেছেন। তারপরই লখিন্দরের মৃত্যুর পর নিদ্রিতা বেহুলার জাগরণ বর্ণনা করে কবি বলেছেন:

'কা কা বলিয়া সঘনে কাড়ে রা।
কাগের রা শুনিয়া চেতন হইল বেউলা।'[৩২]

কাকের ডাকে জেগে উঠেই বেহুলা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরেছে। আবার লখিন্দরের শব নিয়ে যাওয়ার সময়ও বেহুলার—'মঞ্জসখানি লাগিল

যায়া শ্বেত কাগের বাঁবে'। বিষ্ণুপালের কাব্যে শ্বেতকাকের কাহিনীর উপস্থাপনায় আবার অন্যদের তুলনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতকাক এখানে ছদ্মবেশিনী মনসা বা নেতা নয়, সদ্যোজাত শাবকের জননীও নয। সে বারো বছব অনাহারী হয়ে বসে আছে। তাই মৃত লখিন্দরেব মাংস ভক্ষণ করে তার উদর পূর্তি করতে চায়। বেহুলা করুণভাবে তাকে মঞ্জসে বসতে বাবণ করেছে। কাবণ কাক একবার মঞ্জসে বসলে সে ছমাসেও মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। এরপর বেহুলা কাককে 'শ্রীমন্ত অঙ্গুরি' দিয়ে তার মায়ের কাছে নিজেব সংবাদ দিতে বললো। বেহুলাব পিতৃগৃহেব শ্রীরামকদলিব গাছে পশ্চিমদিকে বসে কাক কা কা কবায় বেহুলার মা এসে কুশল বাবতা জানতে চাইলেন। কাক তাঁর হাতে দিল সুবর্ণ অঙ্গুরি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো বিষ্ণুপালেব এই কাক-কাহিনী মনসাব কৃপা প্রচারমূলক নয়। ঘটনার পথ বেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই কাব্যে চলে এসেছে। কাক মানুষের হিতকারী বন্ধু এই লোকবিশ্বাস সাঁওতালদের মধ্যে আছে—একথা আগেই বলেছি। এই কাহিনীতে যেন তারই পবিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে এই কাকপ্রসঙ্গকে একটি বিশেষ ধবনেব লোককথা হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পাবে। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লোককথাকে যে কটি ভাগে ভাগ করা যায় তার একটি হলো পশুকথা। অ্যান্টি আর্নে এবং স্টিথ টমসনের লোককথার টাইপ ইনডেক্সে পশুকথা বিভাগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু, মানুষ ও বন্য পশু, গৃহপালিত পশু, পাখি, মাছ অন্যান্য জন্তু ও বস্তু। আমাদের মনসামঙ্গলের কাক-কাহিনীকে পশুকথারই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আবার রূপকথা ও উপকথায় নানা ধরনের কথা বলা পাখি, জ্ঞানী পাখি ও উপকারী পাখির দেখা পাওয়া যায়। কথা বলা উপকারী পাখি বলতে আমাদের প্রথমেই মনে হয় বাঙলা রূপকথার তেপান্তরেব ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি প্রসঙ্গ। জ্ঞানী পাখির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে—এরা কথা বলা পাখি। মনসামঙ্গলের শ্বেতকাকও কথা বলা উপকারী পাখি। একটি বাঙলা লোককথায় পাওয়া যাচ্ছে একজন চাষির একটি পোষা পাখি ছিল। চাষি যখন মাঠে কাজ করতে যেত চাষি বৌ পাখির গায়ে চাষির জন্য হুঁকো, খাবার সব বেঁধে দিলে পাখি সেই সব জিনিষ মাঠে উড়ে গিয়ে চাষির কাছে দিয়ে আসতো। [দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাঙলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স] মনসামঙ্গলের

শ্বেতকাক এই ধরনেরই উপকারী পাখি। অবশ্য ঠিক লোককথার সরলবৈখিক বিন্যাস এখানে নেই — দেবভাব ষড়যন্ত্র ও বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধন এই কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই কাককথাব উৎস যে বাঙলার এই ধবনের নিজস্ব লোককথা — তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর আর এক বিশিষ্ট কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গলেও শ্বেতকাকের উপাখ্যান আছে। অন্যান্য কাহিনীগুলোর মতো এখানেও বেহুলা মায়ের কাছে সংবাদ দেওয়া হলো না ভেবে দুঃখ করলে মনসা শ্বেতকাকেব রূপ ধরে চাঁপা গাছেব ডালে এসে বসেছেন। বেহুলাকে তার পবিচয় জিজ্ঞাসা কবলে সে সব কিছু জানিয়েছে। কাকরূপিণী মনসা পথের নানা ভয়ঙ্কর বিপদেব কথা বলে তাকে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু বেহুলা তার প্রতিজ্ঞায় অটল। উপরন্তু সে কাককে বলেছে:

'এক নিবেদন মোব নেঅ শ্বেতকাকে।
নিছানি নগরে যাবে মায়ের সম্মুখে।।
প্রভুর হস্তের লেহ সুবর্ণ অঙ্গুরী।
নিসানি মায়েরে দিয়া কয় কথা চারি।...
এই নিবেদন, লৈযা যাঅ শ্বেতকাক।
সুবর্ণে বান্ধিয়া দিব তোমা দুই পাখ।'[৩২]

শ্বেতকাক বেহুলাব মা অমলার কাছে গিয়ে অঙ্গুরী ফেললো। অমলার অনুরোধে বেহুলার সব কথাও তাকে খুলে বললো। এই কাহিনীতে শ্বেতকাকের ছদ্মবেশে মনসার ভূমিকা খুবই সক্রিয়। তিনি বেহুলাব প্রতি করুণাপরবশ হয়ে কাকরূপ ধারণ করেছেন তাকে দুর্গম পথযাত্রায় বাধা দেওযার চেষ্টা করেছেন — অবশেষে তার মায়ের কাছে সংবাদও নিয়ে গেছেন। এইভাবে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যেই শ্বেতকাকেব উপাখ্যানের মাধ্যমে বেহুলার দুঃখের আর বেদনার বর্ণনায় যেন কবিরা নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

বাঙলার অতি পরিচিতি অথচ একটি অসুন্দর পাখি এইভাবে পুরোনো সাহিত্যের পাতায় নিজের জন্য যে জায়গা করে নিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নিয়ে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায়।

---

১. পাণিনি ১১. ৩. ১৭।

২. বৃহৎপরাশরসংহিতা; পঞ্চম অধ্যায়, ৬৮-৬৯ শ্লোক।

৩. তদেব; অষ্টম অধ্যায়; ২৩০ সংখ্যক শ্লোক।
৪. বিষ্ণুসংহিতা; আর্যশাস্ত্র; ২৩শ অধ্যায়; শ্লোক: ৪১।
৫. অন্নং ভূমৌ শ্ব-চাণ্ডাল বায়সেভ্যশ্চৈব নিঃক্ষিপেৎ। 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা'।
৬. সংবর্ত সংহিতা; শ্লোকসংখ্যা-১৪৪।
৭. পরাশর সংহিতা; ষষ্ঠ অধ্যায়; ৪র্থ শ্লোক।
৮. 'সদুক্তিকর্ণামৃত'; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; অপদেশ প্রবাহ। নানাপক্ষিণঃ, শ্লোকসংখ্যা: ৫।
৯. তদেব; শ্লোক সংখ্যা: ২।
১০. মেঘদূতম্; শ্লোক ২৪।
১১. *The Minomini Indians;* by Hoffman W. T., 'বাঢ়েব জাতি ও কৃষ্টি'; মাণিকলাল সিংহ: ১ম সংস্করণ থেকে পুনরুদ্ধৃত।
১২. চর্যাপদ; পদ সংখ্যা-২।
১৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: বংশীখণ্ড।
১৪. ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল; অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত; পৃ. ১৭।
১৫. রূপরামের ধর্মমঙ্গল; অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত।
১৬. গোর্খ-বিজয়; শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত [১৩৫৬] পৃ. ১৮২।
১৭. চণ্ডীমঙ্গল; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; সুকুমার সেন সম্পাদিত; পৃ. ১৩৬।
১৮. দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল [১৯৫৭] ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত: পৃ. ১৫০। [১৯৫৭]
১৯. ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা; দ্বিতীয় খণ্ড; [১৯৭১] পৃ. ৩০৪।
২০. পূর্ববঙ্গ গীতিকা; দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত; চতুর্থ খণ্ড; পৃ. ৩০৪।
২১. বৈষ্ণব পদাবলী: শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [১৯৮০], পৃ. ৪৬৭।
২২. শ্রীধর্মমঙ্গল; ঘনরাম চক্রবর্তী; শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, পৃ. ৭২৯।
২৩. বিপ্রদাসের মনসাবিজয়; সুকুমার সেন সম্পাদিত; পৃ. ২০৮।
২৪. ঐ; পৃ. ২০৯।
২৫. সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ; শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত [১৯৪২] পৃ. ১১২।
২৬. কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ; শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত [১৯৬২] পৃ. ৪৫১।

২৭. ঐ; পৃ. ৪৫০।

২৮. ঐ; পৃ. ৪৫১।

২৯. তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ; ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত [১৯৮০] পৃ. ৪০১।

৩০. কেতকদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল; অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত; প্রথম সংস্করণ; পৃ. ২৬২।

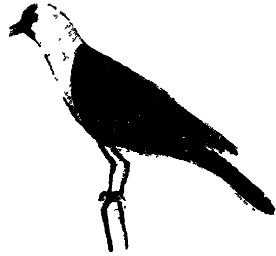
৩১. Visnu Pala's Manasa Mangala ed. by Sukumar Sen; [1968] p. 99.

৩২. উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকদাসের মনসামঙ্গল; বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত [১৯৭৯] পৃ. ৮৬।



কাক : লোকশিল্পে

বিজনকুমার মণ্ডল



লোকশিল্পের সৃষ্টি ব্যবহারিক বা জীবিকার, ধর্মীয় রীতিনীতির কিংবা নান্দনিক প্রয়োজনে। অধিকন্তু, লোকশিল্প জাতীয় ঐতিহ্য এবং পরিবেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কল্পনায় জারিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রকাশও লোকশিল্পকে মাধ্যমে অবয়ব ধাবণ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় লোক-সমাজের চিরায়ত বিশ্বাস ও সংস্কাব, যা অনেক ক্ষেত্রে একটি 'অভিপ্রায়'কে [motiff] আশ্রয় করে মূর্ত হয়।

লোকশিল্পের এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য সমাজ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'অভিপ্রায়ে'র সাঙ্কেতিকতা, রূপক ও গূঢ়ার্থ অনেক সময় সমাজের সাংকেতিক ও ঐতিহাসিক রূপকে ফুটিযে তোলে। শিল্পেব এই বহিপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির তাৎপর্যের বিন্যাসের মাধ্যমে কখনো সূক্ষ্ম, কখনো বা স্থূলরূপ ধারণ করতে পারে। শিল্পের 'অভিপ্রায়'গুলি জীব জগৎ, ব্যবহারিক জীবন বা প্রকৃতি থেকে শিল্পী তার অভিপ্রায়ানুযায়ী করে থাকেন। জীবজগৎ থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে 'পাখি'র 'অভিপ্রায়' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ —যাকে শিল্পবস্তু হিসাবে গ্রহণেব সময় শিল্পী অধিকাংশ সময়েই প্রচলিত লোকবিশ্বাসেব ওপর নির্ভর করে থাকেন। এর মধ্যে পক্ষীজগৎ থেকে গৃহীত এই রকম একটি মোটিফ হল 'কাক।

পাখিদের জগতে 'কাক'কে মানুষ বিশেষ সুনজরে দেখে না। তাদের কালো চেহারা, কর্কশ কণ্ঠস্বর, সব সময় মানুষের ক্ষতি কবার প্রবণতাই এর জন্য দায়ী। কাকের কালো রঙের সঙ্গে অন্ধকারের মিল থাকায় সে অশুভের ইঙ্গিতবাহী। আদিমকাল থেকে মানুষ কালো রঙকে মৃত্যুর সঙ্গে মিশিয়ে দেখেছে— তাই মৃত্যু-জনিত শোক প্রকাশে কালো পোষাক পরার রীতি কোথাও কোথাও আজও প্রচলিত আছে। এই কারণেই কাককে বিবেচনা করা হয় দুর্ভাগ্যের ও মৃত্যুর দূত রূপে—লোকশিল্পী তাই সচেতন ভাবেই কাকের এই রূপকে তাঁদের শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান বা চেষ্টা করেন।

কাকের সঙ্গে যমের অর্থাৎ মৃত্যু-দেবতার সম্পর্ক রয়েছে—কৃত্তিবাসী রামায়ণে এর উল্লেখ পেয়েছি। তা থেকে জানা গেছে যে, দেবতাব বলীয়ান হয়ে একদা রাবণ স্বর্গ জয় করতে এলে দেব বরে রাবণের ভয়ে বিভিন্ন পশু-পাখির রূপ ধারণ করে। যম কাকের রূপ ধরেছিলো। সেই কারণে কাককে যমের দূত হিসাবে মনে করা হয়। লোকশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা পট আঁকেন—যাঁরা পটুয়া বা পট্টিকার রূপে পরিচিত তাঁবা যখন 'পট লেখেন'—বিশেষত যমপট বা যেখানে মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে—যেমন, বেহুলাব বাসর ঘর, সেখানে একটি কাকের পট লিখতে ভোলেন না। প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত বীরভূমের 'যমপট'-এর প্রায় প্রত্যেকটিতেই যমের সঙ্গে কাককে দেখতে পাচ্ছি [চিত্র ১]।

আদিম কাল থেকেই মানুষ তার পরিচিত পরিবেশ থেকে সচেতন ভাবে নানা সময়ে নানা ধরনের সংকেত বা চিহ্নকে নিজেব জীবন-বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ও তার কর্ম-প্রচেষ্টাদির শুভাশুভের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই ভাবেই কাককেন্দ্রিক বিশ্বাস ও সংস্কারগুলির সৃষ্টি; এই সব বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে আবহাওয়া বিষয়ে, অতিথি আগমন বিষয়ে, মৃত্যু এবং নানা শুভাশুভের সংকেত। প্রসঙ্গত মনে আসে কাককে কেন্দ্র করে অশুভ ঘটনার প্রাধান্যের কথাই। —এর সঙ্গে যাদু-বিশ্বাসের যোগকেও পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, কারণ ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রাচিন গ্রন্থ 'কৌশিক সূত্র' থেকেও নানা তথ্য পাওয়া যায়।

লোককাহিনীর [folk talc] মধ্যেও এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে রচিত লোককাহিনীতে শ্রাবণ মাসে তাদের বিয়ে হওয়ায় সেই রাত্রেই বেহুলা বিধবা হয়, তাই কোন কোন জায়গায় শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সংস্কার থেকেই মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লখিন্দবেব প্রত্যাসন্ন মৃত্যুব দূত হিসাবে কাকের ছবি এঁকে পটুয়াচিত্রটিতে যে সাংকেতিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা বিশেষভাবেই প্রণিধান যোগ্য। বেহুলার ঐ বাসর ঘরের ছবি লেখার সময় ঐ গভীর রাতেও ঐ ঘরের এক কোণে একটি কাককে আঁকতে ভুল করেন নি। বীরভূমের একটি জড়ানো পটে মনসামঙ্গলের কাহিনী আঁকবার সময়েও ঐ একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন শিল্পী [ছবি ২]।

মৃত্যুর পর মানুষকে যমালয়ে যেতে হয়, সেখানে চিত্রগুপ্তের খাতার হিসেবানুযায়ী পাপপুণ্যের তৌল করে শাস্তি বা পুরস্কার পায়। অক্ষর জ্ঞানহীন

লোকশিল্পী এ তথ্য ভালভাবেই জানেন এবং তাঁর সহজাত শিল্প-প্রতিভার শক্তিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে 'ডিটেলে' যমালয়ের বিচিত্র শাস্তি ও পুরস্কারের কাহিনীগুলিকে তুলে ধরেন। ঐ সব পটের ছবিতে দেখা যায় মর্ত্যলোকে মানুষের কর্মফলানুযায়ী যমলোকে ব্যবহার পেতে; এবং এই সমস্ত ছবির মধ্যেও পটশিল্পী যমের দূত কাককে সুনির্দিষ্ট জায়গা দিতে ভুল করেন না। একাধিক পটচিত্র থেকে এর উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারি; যেমন গুরুসদয় সংগ্রহশালায় একটি রামায়ণ পট পাচ্ছি [GM 1640] যার শেষাংশে ঐ ভাবে কাকেরও জায়গা হয়েছে [ছবি ৩ দ্রষ্টব্য]।

কাক সব সময় মানুষের কাছে অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে তা নয়; —কারণ প্রচলিত ও বিশ্বাস থেকে জানতে পারছি যে:

একটি কাক—দুঃখ আনে।
দুটি কাক—আনন্দ আনে।
তিনটি কাক—বিবাহ অনিবার্য করে তোলে।
চারটি কাক—সন্তান জন্মের ইঙ্গিতবাহী।

এছাড়া নবান্নের সময় কাক আমাদের কাছে একান্ত কাঙ্ক্ষিত। বাঙলার আচরিত রীতি অনুযায়ী পিতৃপুরুষের উদ্দেশে 'তর্পণ' করে কাককে 'বলি' [কলাপাতায় নতুন ধানের আতপচালের ভাত, ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি কাককে খাওয়ানো] উৎসর্গ করা হয়। কাক এই 'বলি' গ্রহণ করলে তবেই বাড়ির অন্যান্যরা নতুন অন্ন মুখে তোলে।

নবান্নে কাউকে 'বলি' দেওয়ার পেছনের লোকবিশ্বাস হল মৃত্যু ভয়। লোকশিল্পের অন্যতম শাখা আলপনা চিত্র বিশেষ করে ব্রতের আলপনা থেকে এর উদাহরণ পেতে পারি। 'যম বুড়ি'র ব্রতে একটি মাটির দাঁড়কাক তৈরি করা হয়। মৃত্যুর দেবতা যমের বুড়ি মায়ের কল্পনা এবং তার সঙ্গে কাজের কল্পনা অবশ্যই লৌকিক সংস্কার থেকে এসেছে। কাককে নবান্নের ভোজ দিয়ে আগে তুষ্ট করার মধ্যে মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ এবং 'যমবুড়ি'র ব্রত পালনের দ্বারা সন্তানের মঙ্গল কামনা ও অকালমৃত্যু নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

মন্দির গাত্রের প্যানেলে আঁকা কাকও ঐ একই মনস্তত্ত্বের অঙ্গীভূত। শিকারীর আক্রমণে ভীত শিকারের পলায়নের মধ্যে কাকের অবস্থান আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিতবহ। কালিঘাটের পটচিত্রে ডালে বসা একক কাক একদিকে যেমন শিল্প-সৌন্দর্যের

অতুলনীয় নিদর্শন তেমনি মানুষের বিশ্বাসের সূত্রানুযায়ী একক কাক দুঃখের ইঙ্গিত বয়ে এনে থাকে। কালিঘাটেব একক কাক শিল্পীর কিংবা শিল্পকর্মের হয়তো কোন অশুভ সংকেত! [ছবি – ৪]

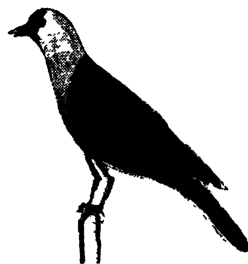
সবশেষে আমরা বলতে পারি যে লোকশিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কাক' অশুভকে বহন করে আনতে পারে বা এনেছে এই ধারণা বা বিশ্বাসই ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই লোকশিল্পের প্রত্যেকটি প্রকরণেই কাক যেন অশুভের, ক্ষতির ও দুঃখের বার্তাবহ।



এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রতিটি ছবিই গুরুসদয় 'সংগ্রহ শালা'র সৌজন্যে প্রাপ্ত। ছবিগুলি সংগ্রহশালার ভুক্তিকরণের সংখ্যা যথাক্রমে GM 1707, 1674, 1640, 134

কাক : জীবনানন্দ

সনৎকুমার মিত্র



১. বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন: "আফিমের একটু বেশি মাত্রা চড়াইলে: 'আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—'।" আফিমের মাত্রা আদৌ না চড়িয়ে আমি দেখতে পাই এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রেণীভেদ [Class division] প্রবল। একদিকে উচ্চশ্রেণী, অন্যদিকে নিম্নশ্রেণী। একদিকে ভদ্রলোকেরা, অন্যদিকে ছোটলোক। একধারে উচ্চবর্ণ—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-ক্ষত্রিয়-কায়স্থ, অন্যপ্রান্তে নিম্নবর্ণ-দাস-শূদ্র-হাড়ি-মুচি-ডোম। আরো স্পষ্টভাবে দেখলে এই ভেদ অনলে-অনিলে, আকাশে-পাতালে, বৃক্ষ-তরুলতায়, পশু-পাখিতে। এই ভূলোক ছাড়িয়ে দেবলোকের দিকে তাকালেও পরিষ্কার ভেদরেখা দেখা যাবে—পেয়ে যাবো ভদ্রলোক দেবতাদের—বরুণ-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য-ব্রহ্মা- বিষ্ণু-রুদ্র; অন্যপ্রান্তে রয়েছেন ছোটলোক দেবতারা যেমন, শেতলা-চণ্ডী-মনসা-ঘেঁটু-পেঁচো-শনি প্রমুখেরা।

২. গাছ-গাছালি-ফল-ফুলের জগতেও শ্রেণীভেদ প্রকট। তাদের পাশে রেখে পশু ও পাখির সমাজের শ্রেণীবিন্যাসটির একটু খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। উচ্চবর্ণ কুলীন পশুরা হলেন—বাঘ-সিংহ-চিতা-হাতি-হরিণ; আর নিম্নবর্গেরা হলেন: শেয়াল-কুকুর-ইঁদুর-ছুঁচো-সজারু-বিড়ালেরা।

২.১. জীবনানন্দের কাব্যে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ ছোটলোক Class-এর গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফল-ফুল, পশু-পাখির বড় উঁচু ঠাঁই। কবির ব্রহ্মাণ্ডে নিম্নবর্গ কেন এই পক্ষপাত পেয়েছে, কেন তিনি এমনটি ঘটিয়েছেন তার উত্তরে পরে আসবো। তার আগে আমরা দুটি ফর্দ তৈরি করে নেবো। প্রথমটি হবে তাঁর ৩৫ বছর [মৃত্যু : ১৯৫৪] প্রলম্বিত কাব্যচর্চার তালিকা ['১৯১৯-এর বৈশাখে 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে শ্রীজীবনানন্দ দাস বি.এ. প্রণীত ষোল ছত্রের 'বর্ষ আবাহন' কবিতা প্রকাশিত হয়, এখনও পর্যন্ত এটিই তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা বলে জানা গেছে। [দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার দাস]।

২.২ 'ভারবি' সংস্করণ 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ' [১৯৯৩ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত]-এর সাহায্যে তৈরি প্রথম ফর্দ—

২.৩ সংযোজন সহ মোট সাতটি কাব্যগ্রন্থ এবং দু-দফার 'অন্যান্য' কবিতা মিলিয়ে মোট পাঁচ-শ আশিটি [৫৮০] কবিতা ঐ সংগ্রহ থেকে পড়তে পারছি। এর মধ্যে :

ক) 'ঝরা পালক'-এ [১৯২৭] ৩৫টি।

খ) 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে [১৯৩৬] ১৭টি।

গ) 'বনলতা সেন'-এ [১৯৩৫] ১২ + ঐ—সংযোজন-এ [১৯৫২] ১৮ + ঐ—আবার সংযোজন-এ [১৯৫৪] ৩ = ৩৩টি।

ঘ) 'মহাপৃথিবী' [১৯৪৪] ২২ + ঐ—সংযোজন [১৯৫৪] ৩ = ২৫টি।

ঙ) 'সাতটি তারার তিমির'-এ [১৯৪৮] = ৪০ টি।

চ) 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-তে [১৯৫৪] = ১২ টি।

ছ) 'রূপসী বাংলা' [১৯৫৭] এবং ১৯৮৩-ব সংযোজন ধবে = ৭৩ টি।

জ) 'বেলা অবেলা কালবেলা'-তে [১৯৬১] ৩৯ টি।

ঝ) 'অন্যান্য কবিতা' [১৩২৬ থেকে ১৩৬১ মধ্যেকার রচনা] ২৭৯ টি।

ঞ) 'আনুষঙ্গিক কবিতা' [১৯৩১–১৯৫৪ মধ্যেকার] ২৫ টি।

ট) 'পরিশিষ্ট'-এ ধৃত ২ টি কবিতা।

অতএব উক্ত কাব্যসংগ্রহ মতে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সাতাশ বছরে জীবনানন্দের লেখা কবিতা পাচ্ছি মোট ৫৮০ টি। এতো বড় মাপের কবির পক্ষে সংখ্যাটি বেশ কমই। তবে আয়ুষ্কাল মাত্র পঞ্চান্ন বছর।

২.৪ এবারে ঐ ৫৮০ টি কবিতার সাহায্যে পূর্ব-কথিত নিচের থাকের বা ছোটলোক পাখপাখালিদের নিয়ে একটি ফর্দ তৈরি করা যেতে পারে :

ক) **পেঁচা—লক্ষ্মী পেঁচা—নিম পেঁচা** = ৫৭ বার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে 'পেচা'র ওপর একটি পূর্ণ কবিতা।

খ) **চিল / শঙ্খচিল / সোনালী ডানার চিল / গাঙ চিল / সমুদ্র চিল / - সিন্ধু চিল** = ৫৮ বার। এর মধ্যে 'বনলতা সেন'-এ 'হায়চিল' এবং 'অন্যান্য কবিতা গুচ্ছ'-এ 'সমুদ্র চিল' শীর্ষক দুটি সম্পূর্ণ কবিতা পাচ্ছি।

গ) **শালিখ / গাঙ শালিখ** = ৪৪ বার।

ঘ) **শকুন** = ২৫ বার। এর মধ্যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে 'শকুন'কে নিয়ে একটি গোটা কবিতা লেখা হয়েছে।

ঙ) **মাছরাঙা** = ৩২ বার।

চ) **হাঁস / বুনো হাঁস / হংসী / বালিহাস / রাজহাঁস**-এর ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৭২ বার। 'বুনো হাঁস'-এর ওপর একটি পূর্ণ কবিতা রয়েছে 'বনলতা সেন'-এ 'হাঁস' শিরোনামে, 'সাতটি তারার তিমির'-এ আর একটি। এ-ছাড়াও 'অন্যান্য কবিতা' সংকলনে 'নির্জন হাঁসের ছবি' নিয়ে একটি গোটা ছবি বানিয়েছেন কবি।

ছ) **'ঘুঘু'**-র প্রসঙ্গ এসেছে ২৬ বার।

জ) **'বক'**-এর উল্লেখ ১১ বার।

ঝ) **'বাদুড়'** [যদি একে পাখি বলি] আমাদের সামনে উড়ে বসেছে ১৯ বার।

ঞ) **কাক / দাঁড়কাক** = এর প্রসঙ্গ এসেছে ৩৫ বার। আর 'রূপসী বাংলা'য় 'দাঁড়কাক'কে নিয়ে একটি আস্ত কবিতা লেখা হয়েছে।

২.৫ ওপরের যে দশটি পাখ-পাখালির উল্লেখ করা গেল তারা ছাড়াও কবি উপমা প্রয়োগে, বাক্-প্রতিমা নির্মিতিতে, কাব্যবক্তব্য-ব্যাখ্যায় অথবা হৃদয় উন্মোচনে চড়ুই, পায়রা, চাতক [ঝরা পালকে 'বনের চাতক, মনের চাতক' শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ কবিতা], নীলকণ্ঠ, সারস, টিঁয়া, বুলবুলি, গিরেবাজ, টুনটুনি, বউকথা কও, মুনিয়া ইত্যাদি বাঙলার অতিপ্রিয় এবং অতিপরিচিত প্রায় ৩৪ রকম পাখির প্রসঙ্গ-জীবনাচরণ, এমন কি রঙ-আহার-বাসা বাঁধার স্বভাবকে তাঁর কবিতায় বারে বারে এনেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোন নির্দিষ্ট পাখির নাম না করে কেবল 'পাখি' তাঁর কবি-ভাষার ডালে বসেছে ২৫৭ বার।

৩. এতক্ষণ জীবনানন্দের কবিতায় সংখ্যার কিচির-মিচির দিয়ে পাখিদের উল্লেখে আমার প্রাজ্ঞ পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদিত হয়েছে বলে মনে করি। যাঁরা জীবনানন্দকে 'শুদ্ধতম কবি' বলে ভাবেন, 'কবির কবি বলে' শ্রদ্ধা করেন, কিংবা তাঁতে সুরারিয়ালিজম বা অস্তিবাদ যাঁদের অন্বিষ্ট, অথবা কবির আত্মসমীক্ষার সূত্রে কবিকে 'নির্জন বা নির্জনতম, প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার, অথবা একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার' কবি হিসাবে ব্যাখ্যা, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জীবনে আনন্দ পান তাঁদের অবগতির জন্য সবিনয়ে 'কবির সঙ্গে নিকট আত্মিক সম্পর্ক উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁর এমন সুখ্যাত অধ্যাপক ও প্রবন্ধকার-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমার কাজের পক্ষে প্রশ্রয় গ্রহণ করবো। তিনি

লিখছেন: 'জীবনানন্দ দাশের ঐতিহ্যচেতনা যেমন সদাজাগ্রত তেমনই সুতীক্ষ্ন সংবেদনশীল চেতনা ছিল গ্রাম বাঙলার গাছপালা, পাখি, জন্তু সম্বন্ধে। বাঙলার ফ্লোরা এবং ফনা সম্বন্ধে এমন পুনরাবৃত্ত উল্লেখ আব কোনও লেখকের আছে বলে আমার মনে হয় না, এত পাখি, জন্তু, গাছ, ফুল, ফল রবীন্দ্রনাথও জানতেন না। আমার অধ্যয়ন গণ্ডীর মধ্যে একমাত্র শেক্সপীয়র জানতেন; এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় অক্সফোর্ডের ক্ল্যারেন্ডন্ প্রেস থেকে প্রকাশিত বৃহৎ দুইখণ্ডী গ্রন্থের অ্যানিম্‌ল্‌স এবং প্ল্যান্ট্‌স্ শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটিতে। শেক্সপীয়রের জ্ঞানেব পবিধি কত প্রসারিত ছিল সেকথা বোঝা যায় যখন জানি যে তিনি তেইশ রকম গমের কথা জানতেন। বহু সংখ্যক ফুল ফল গাছ মাছ পাখিব কথা জানতেন। জীবনানন্দর জ্ঞানের পবিচয় পাই বহু বিচিত্র পাখি ও প্রাণীর নামে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি শ্রেণীব মাত্র পঞ্চাশটি নাম দিচ্ছি, আরো নাম মেলা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়' [ড. অমলেন্দু বসু: 'জীবনানন্দ' (১৯৮৪): পৃ. ৫৩–৫৪]। এই বলে প্রবন্ধকার 'ঝাউ', 'হরিতকী', 'আমলকী', 'বঁইচি', 'শেয়ালকাঁটা', 'হেলেঞ্চা', ইত্যাদি পঞ্চাশটি বৃক্ষ-লতা-গুল্মের নাম দিয়ে বলছেন, 'এই তালিকা মোট সংখ্যার ভগ্নাংশ মাত্র'। এবং 'সম্বর', 'হরিণ', 'সজারু', 'ফড়িং', 'শ্যামাপোকা' ইত্যাদি পঞ্চাশটি জন্তু-জানোয়ার-কীট-পতঙ্গের নাম দিয়ে এ-বিষয়ে জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'এসব তরুলতা নানারকম প্রাণ সম্বন্ধে উল্লেখে কবি জীবনানন্দের স্বভাবজ বস্তুচেতনার নিদর্শন পাই, বস্তুনির্ভর অভিজ্ঞানই তাঁকে নিসর্গ প্রেম ও সময়, মৃত্যু, ইতিহাসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।'

৩.১ অতএব আশা জীবনানন্দের কবিতায় আমার পক্ষিচর্চা অবোধ কিচির-মিচিরে পর্যবসিত হবে না। অধিকন্তু আমি বোধ হয় একথা সবিনয়ে নিবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি যে, অতি সীমিত পরিসরে হলেও জীবনানন্দের কাব্যলোকে 'অ্যানিমল্‌স এবং প্ল্যান্ট্‌স'-এর দিকে সুজিজ্ঞাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। এ-বিষয়ে আরো মনস্ক এবং যোগ্যতর কাজ জীবনানন্দচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৪. ওপরের দীর্ঘ ফর্দ থেকে পাখ-পাখালির যে তথ্য বেরুলো তা জীবনানন্দের কবিতায় কোন উপযোগ তৈরি করেছে সেকথা বলার আগে একটা কথা খুব বড় করে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে নিশ্চয়ই। জীবনানন্দ যে ঐ সব পাখ-পাখালি তাঁর কবিতায় এনেছেন তা কি কেবল আনার জন্যই আনা?

আমরা জানি যে, কোন প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে একটি শব্দ-প্রয়োগ বা এক ফোঁটা রঙের ব্যবহার অথবা একটি ছেনীর ঘা কিংবা একটি মীড় দেওয়াও অপ্রয়োজনীয় নয়। তাই জীবনানন্দের মতো শব্দ-গন্ধ-রঙ-রস সচেতন কবি একটি কমা বা হাইফেন বা সেমিকোলনও অপ্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি — যে কোন তন্নিষ্ঠ জীবনানন্দ পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। অতএব কবি গাছ বা লতাগুল্ম, কিংবা নদী-পর্বত-প্রান্তর-মেঘ অথবা পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গকে তাঁর কাব্য-সংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সাদরে-আন্তরিকতায় এবং সর্বোপরি নান্দনিক প্রয়োজনে।

৫. যে প্রায় পঞ্চাশ রকমের পাখির কথা এসেছে জীবনানন্দের ৫৮০টি কবিতায় তাদের মধ্যে আমি কেবল 'কাক'-কে বেছে নেবো। 'কাক' ছাড়া জীবনানন্দের কাব্যাকাশের অন্য অনেক পাখির উপযোগ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা যায়, তা আগেই বলেছি।

৬. কাক নামক 'নিঘিন্নে' / 'ঝাড়ুদার' পাখিটি কবির কাব্যে ৩৫ বার এসে কোন পরিবেশ রচনা করেছে তা প্রথমে দেখা যাক।

ক. ঘরে ফেরা কাক :

১) 'সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা
ফিরেছি যারা ঘরে'; [ধূ. পা. ১৫৪]।

২) 'তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে' — [ব. সে. ১৬৪]।

৩) 'আসন্ন সন্ধ্যার কাক — করুণ কাকের দল
খোড়ো নীড় খুঁজি / উড়ে যাবে' — [রূ.বা ৩৬০]।

৪) 'এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে' — [রূ. বা. ৩৬৯]।

৫) 'যখন মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক পেয়েছো গো
ঘরের সন্ধান' [রূ.বা ৩৮১]

৬) 'মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায়...' [অ. ক. ৫০৮]

৭) 'সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক
বিশ্রাম কল্যাণ,' [অ. ক. ৬৭৮]

খ. নীড় নির্মাণকারী কাক :

১) 'সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তাল বনে — মুখে
মুখে দুটো খড় / নিয়ে যায়' [রূ. বা. ৩৫৪]।

২) 'দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর /
পাখনার শব্দ করে অবিরাম' [রূ. বা. ৩৭৬]।

৩) 'কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায়!
শ্যাওড়ার ঝাড়ে।' [রূ. বা. ৩৭৬]।

৪) 'দাঁড়কাক একা একা সারা রাত জাগে'; [রূ. বা. ৩৮৩]।

গ. প্রতিকী কাক :

১) 'নীরব নরম দাঁড়কাক / ভেরছা ডানার ছায়া'
[অ.ক. ৬৯০]।

২) 'উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে / নীল জাফরান হয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সব' [অ. ক. ৭০৮]

গ. স্মৃতির কাক :

(১) 'সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি
কালো দাঁড়কাক / সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির'
—[রূ. বা. ৩৬৫]।

২) 'মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের ধূল'
[ঐ. ৩৬৬]।

৩) 'একদল দাঁড়কাক ম্লান গুঞ্জরণে / নাটার মতন রাঙা
মেঘ নিঙড়ায়ে নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ
দু-মুহূর্তে ভরে রাখে—' [রূ. বা. ৩৭০]।

৪) 'ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক ঐ বেলগাছটির তলে / রোজ ভোরে
দেখা দিত—অন্য সব কাক আর শালিখের হৃষ্ট
কোলাহলে /
তারে আর দেখি না কো—' [রূ. বা. ৩৮০]।

ঘ. নবান্ন ও কাক :

১) 'এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ওপাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেতো;
এখন টু শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও;'
[শ্রে. ক. ১৯৪৬-৪৭। ৩২৮]

২) 'হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে'
[রূ. বা. ৩৫৭]

৩) 'দাঁড় কাক'—নবান্নের ভোরে' [রূ. বা. ৩৬৩]।

এ-ছাড়াও 'কাক দম্পতি'র কথা আছে, আশ্বিনের কাকের প্রসঙ্গও আছে, আছে কেবল কাকের কলরবের কথাও।

৭. জীবনানন্দ কখনও কেবল 'কাক' কখনও 'দাঁড়কাক' এই দুটি নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করেছেন। বাঙলায় কাক দু-প্রকারের 'পাতি' ও 'দাঁড়'। কোলকাতায় ও আশে-পাশে সবাই পাতি কাক। দাঁড়কাক নেই। হয়তো বরিশালের দাঁড়কাকের প্রাধান্য আছে। এবং সেই স্মৃতি তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একি শুধু স্মৃতিকে ব্যবহার করা? তা তো নয়। কবি তাঁর কাব্যে 'বাক প্রতিমা' তৈরির জন্য এবং কাব্য-বক্তব্যে বিশেষ অর্থ সম্পূরণ করার জন্য কাককে ব্যবহার করেছেন। মহৎ কবির শব্দে / বাক্যে বাচ্য অর্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্য অর্থই প্রধান ও চমৎকারী। ঘন্টাধ্বনি থেমে গেলেও যেমন তার অনুরণন কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয় তেমনি শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্যার্থের সূত্রে স্পন্দিত হয় ব্যঙ্গার্থ [suggested sense]। জীবনানন্দের জীবন পাশের বস্তুনির্ভর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে গাছ-গাছালি-নদী-নালা-পশু-পাখিরা এসেছে, কবি তাদের প্রাকৃত ব্যবহার ও জড়-জীবন সুলভ স্বভাবকে আশ্রয় করে তাঁর কবিভাব ও ভাবনায় রসরূপ দিয়েছেন। এখানে জীবনানন্দ ব্যবহৃত পশুপাখির সঙ্গে কাক ও তার রূপ ও স্বরূপ গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্রহ্মস্বাদসহোদর রসপ্রাশনের সহায়ক হয়েছে।

৭.১. আমরা আগের ৬ নং অনুচ্ছেদের 'ক' অংশে দেখেছি যে কবি কাকের ঘরে বা নীড়ে ফেরার ছবি অন্তত সাতবার এঁকেছেন। সন্ধ্যা হলে পর 'সব পাখি ঘরে ফেরে'— কাকও ফিরেছে। কিন্তু অন্যান্য সব পাখির থেকে 'কাক' সবচেয়ে বেশি গৃহগত প্রাণ। তারা সব সময়েই বাসার খুব কাছে কাছেই থাকে। বাসার কাছে কেউ এলেই তারা সদলে চিৎকার আরম্ভ করে দেয়, মাথায় ঠোক্কর দেয়। এমন ঘর কুনো—ঘর পিয়াসী পাখি—বাঙালির মতো, পক্ষীলোকে আর কেউ নেই। মাঘ মাস পড়তেই তাই কাঠ-কুটো জোগাড় করে ঘর সারাতে লেগে যায়। আমাদের কবি কাকের এই গৃহগত প্রাণকে তাঁর কাব্যের 'রঙ ভাঙানি'র কাজে লাগিয়েছেন, —তাঁর জীবনী থেকে খবর পাই, ঘর ছেড়ে দূরে গিয়ে চাকুরি করতে হবে বলে অনেক সময় দারিদ্র্য সহ্য করেও দূরে কাজ নেন নি বা নিলেও বেশিদিন সে কাজ করতে পারেন নি।

৭.২ কবির জন্ম বরিশালে। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন, ব্রজমোহন কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে [ঐ-জুন]। দীর্ঘ ৪৭ বছরের পূর্ববঙ্গ [মূলত বরিশালী]—জীবন শেষ হয়। কিন্তু তবুও 'রূপসী বাঙলা' তাঁকে আজীবন ব্যথিত করে রেখেছিল। সেই ব্যথা থেকেই নবান্নের কাক, কাকেদের ডাকের স্মৃতি তাঁর কবিতায় বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। 'সাত পুরুষের বাস'—সোনার চেয়ে দামি যে মা-মাটি তার কথা কি সহজে ভোলা যায়—বিশেষত জীবনানন্দের মতো গৃহ-স্থ কবি-মানুষ। তাই এই 'কাক' শুধু কাক-ই নয় তাঁর ধূসর ও বেদনাময় অস্তিত্বের প্রতীক।

৭.২.১ উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার বোণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে নতুন ধান / ভাত খাওয়া উপলক্ষে শালপাতার 'দুনি' করে চাল / বা অন্ন নিবেদন করার রীতি আছে—যা কাককে খাওয়ানো হয়। উভয়তই কাককে নতুন চালের তৈরি ভাত খেতে দেওয়া হয়; মনে করা হয়, কাক অন্ন গ্রহণ করলে তার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মাদের কাছে তা পৌঁছে যাবে। তাই কাকের সঙ্গে প্রেতলোকের সম্পর্ক বিষয়ক ধারণা আমরা ভারতীয় আদিবাসী সমাজ থেকেই গ্রহণ করেছি এমন মনে করা যেতে পারে।

৭.২.২ যদিও জীবনানন্দে আমরা যে ৩৫ বার কাকের দেখা পেয়েছি তাতে কোথাও তাকে প্রেতলোকের দূত—এমন প্রতীক হিসাবে মনে হয় নি।

৮. নিবিষ্ট চিত্ত জীবনানন্দ পাঠক হিসাবে আমি এ-কথা বলতেই পারি যে: জীবনানন্দের কাব্যের 'সিদ্ধরস' হচ্ছে **ক.** সময়-চেতনা ও **খ.** নিসর্গপ্রেম। সময়-চেতনা থেকে অতীত এবং মৃত্যু চেতনা এলো, যা **ক.**-এর অঙ্গীরস। এবং নিসর্গপ্রেম থেকে এলো দেশপ্রেম—প্রধানত / মূলত বঙ্গপ্রেম,—যে 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায় না'—আরো নিকটে এসে নরম মমতায় বলে, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ / খুঁজিতে যাই না আর:'

৯. পরিশেষে, 'বাঙলার ঐতিহ্য ও বাঙলার নিসর্গ শোভা সম্বন্ধে সদা-প্রদীপ্ত চেতনা জীবনানন্দ দাশের প্রতি রক্ত কণিকায় মিশে ছিল।' তাই কবি বাঙলার পাখ-পাখালি, ঘাট-ঘাটলা, ফুল-ফুলুরি, ফল-মূল-এর প্রতি প্রাকৃত ও বাস্তব প্রীতি থেকেই 'ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কত বার' খড় কুড়িয়ে 'এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে' এখানেই ঘর বেঁধেছিলেন।

□

কাক : আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে

শুভঙ্কর ঘোষ



'মানুষের কৃতজ্ঞতা খাঁচায় পোষে নি তাকে দুধকলা দিয়ে
সেও তাই জন্ম জন্ম খাঁচাছাড়া উড়েছে আকাশে
ঈগল বা শকুনের মত অত দূরে দূরে নয়
মানুষের পৃথিবীর কাছাকাছি যে আকাশ
সে আকাশ তারা ভালোবাসে....

কাকেরা আশ্চর্য পাখি
মোরগ ডাকার আগে অন্ধকারে তারা ডেকে ওঠে...'

[পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কাকেরা আশ্চর্য পাখি']

আশ্চর্য পাখি কাকেরা মানুষের সমাজে সম্পর্কিত হয়ে, কালেকালান্তরে, বেঁচেবর্তে আছে তাৎপর্যবহ হয়ে: একালের কবি তাই দেখেছেন, অখ্যাতির দায় নিয়ে কাকেদের আজীবন বেঁচে থাকা; এই কাক ভোর আনে, 'কালো কালো ডানা থেকে শীতের কুয়াশা ঝেড়ে / ঘুম ভাঙানোর দায়—সেই তো তাদের।' কাকজন্ম ও জীবন, কাককেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা সাহিত্যে নানামাত্রিক হয়ে ধরা দিয়েছে।

এই কাকেদের অর্থাৎ 'দণ্ডচারী বর্গ'ভুক্ত বায়সবংশের পরিচয় পাওয়া যায় অজয় হোমের 'বাঙলার পাখি' [১ম খণ্ড] গ্রন্থে। তিনি লিখছেন: 'সমস্ত পক্ষিকুলকে বিজ্ঞানীরা ২৭টি বর্গে বা গোত্রে [অর্ডার] ভাগ করেছেন। কাক যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তার নাম যষ্টিমাদি বা দণ্ডচারী বর্গ [পাসসেরিফর্মেস], অর্থাৎ যারা গাছের ডালে বসে। এই বর্গে ৫৫টি বংশ বা পরিবার [ফ্যামিলি] এবং তারা ৫,১১০ টি জাতিতে [স্পিসিস] বিভক্ত। উপজাতির [সাবস্পিসিস] সংখ্যা অসংখ্য। গণের [জিনস] কথা ছেড়েই দিলাম।' বিস্ময়ের কথা, 'ছিটেফোঁটা মস্তিষ্ক' নিয়ে মানুষের মতই এরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। এই দণ্ডচারীবর্গভুক্ত 'বায়সবংশের ৮টি গণ—কাক [কর্ভাস], কৃশকূট [ডেন্ডকিট্রা] ফলভুক [নুকিফ্রাগা; ইংরেজি নাটক্রাকার], কূট [পাইকা, ম্যাগপাই], হরিৎকূট

[কিট্টা, গ্রীণ ম্যাগপাই], জল্লাক [গ্যাররুলাস; জ], ভূ-কাক [পোডোকেস; হিউমান গ্রাউন্ড চাফ] ও সুবর্ণকাক [পাইরহোকোরাক্স; আলপাইনচাফ]। সুবর্ণকাকের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। কাক ও হাঁড়িচাচা [কৃশকূট] সমতলের পাখি। বাকি সব হিমালয় ও বহির্হিমালয়ের পাখি।' পাখিসমাজে কাকের এই যে বৈচিত্র্য ও নানারূপের বিশিষ্টতা, এ নিছক প্রকৃতিলোকে বা জনজীবনের দৈনন্দিতায় উপস্থিত তা নয়; বাঙলা সাহিত্যেও তার সমূহ উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে হয়।

বাঙলা লোকসাহিত্য, লোকসংস্কারে, পুরাতন বাঙলা সাহিত্যে, ছড়ায়, প্রবাদ-প্রবচনে নাথগীতিকায়, ধাঁধায়, লোকউপমায় কাকের উল্লেখ তাৎপর্যবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরাতনকালে অন্ত্যমধ্যযুগে, আধুনিক কালে ও উত্তর আধুনিক সাহিত্যে কাকের বিচিত্র পরিচয় আমাদের কাছে নব নব ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। এখানে আমরা মনে করতে পারি, কিছু কবিতা-নাটক-উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাকের বিশেষ রেফারেন্স—'মায়ারূপ কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে' [দাশু রায়]; এখানে কাক নিদ্রা বলতে বুঝি কপট নিদ্রা। বা, 'কাকে যেমন লাগে ফিঙে, বাঘে লাগে ফেউ।' [দাশু রায়] 'কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে।' [ঈশ্বরগুপ্ত]। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ লক্ষ্য করি 'ঠকচাচাও তো অনেকের মাথা খেয়েছেন, তবে ওঁর মাথা খেতে দোষ কি? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই' এবং 'মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত।' কিংবা, দাশু রায় যখন জানান, 'গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কাগাবগা বলিব কি হেতু' তখন অর্থ বুঝি ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। দীনবন্ধু মিত্র-র লেখাতেও কাকের ব্যবহার, যথা—'পাড়ার ছেলেরা আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙে লাগে।' রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ব্যাপক ব্যবহার না পেলেও কাকের উল্লেখ একেবারে নেই বলা যাবে না। 'ইংরেজরা যদি বলে যে কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাহলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন।' [রবীন্দ্রনাথ]। বা, 'না কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সূর্য্যিমামার দেশে আসতে পারতাম।' [শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত]।

কাক-আশ্রয়ী বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের উদাহরণ যখন কোনো সমালোচক এভাবে দেন 'কাকস্য পরিবেদনা', 'কাকজ্যোৎস্না', 'ঝোড়ো কাক',

'কাকতালীয়', 'তীর্থের কাক', 'ভুশণ্ডীকাক' 'কাক-সকাল' — তখন অবলীলায় মনে পড়ে যাবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'র 'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসের কথা। এখানে সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে কাকের তাৎপর্যবিশ্লেষণ না থাকলেও শব্দগুচ্ছটির বিশিষ্টার্থ যথাযথ ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসের নামকরণে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে 'কাক' প্রতীকে, ব্যঞ্জনায়, বিশিষ্টার্থে মনুষ্যচরিত্র ও মনুষ্যজীবনকেন্দ্রিক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে বারেবারে। আমরা এ-সম্পর্কিত কিছু কবিতা-গল্প-উপন্যাস এখানে উল্লেখ করব। এইসব রচনায় কাকের ব্যবহার শিল্পিত স্বভাবে বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমরা একথাও মনে রাখব, এ-ধরনের লেখা কখনো সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। এই লেখার বাইরেও অসংখ্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস থাকবে যেখানে কাক অভিনব মহিমায় উপস্থিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' উপন্যাসে হৃদয়হীন বিচ্ছু ছেলে রিদয়ের বুড়ো আঙুলের মত ভয়ানক ছোট হয়ে যাওয়া অবস্থায়, 'আসামী বুকুষ্ঠি' অধ্যায়ে, 'কাকেদের সঙ্গে পরিচিতি'র বর্ণনা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ হয়ে উঠেছে। এখানে গল্পবস্তুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কাক-চরিত্র, কাকেদের শ্রেণীবিভাজন। অবনঠাকুর কাকবর্গের বিষয়ে কতখানি অবহিত ছিলেন, তা বোঝা যায়, তাঁর অসাধারণ রেখা চিত্রণে, এ উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও উল্লেখ করার লোভ সামলানো খুবই কঠিন:

'আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালি যুগি কায়েত বামুন এমনি নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায় মানুষ, তেমনি কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে— যেমন ডোমকাক বা যমকাক, ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, ঢোঁড়াকাক, পাণিকাক বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বা ছিটেকাক, ভূষোকাক বা ভুষুন্ডেকাক! সব কাকেরই চালচলন এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনো দল তারা ভদ্দর সভ্য-ভব্য কাক, ছোলা কলা চিংড়ি মাছটা আঁসটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়। আর একদল কাক তারা যা খায় বাচবিচার নেই, পাখির ছানা খরগোসের ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোন দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরিচামারি, খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরে কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই! আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথায় ঠোকর বসায়,

চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় ছোঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে বেড়ানোই এদের কাজ।

'কাকেদের ডাক নাম শুনলেই বোঝা যায় কোন দল কেমন—যেমন যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদেব সবাই ভয় করে। মবা জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি, মারামারি এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক—এরা পুরনো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরীতে মজবুত বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদেব পরামর্শ মতো চলে। তারপর ঝোড়ো কাক—এবা এককালে সবচেয়ে সাহসী বড়ই নামজাদা বাজবংশ ছিল। এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়াকাক হয়ে পড়েছে, কাজেই চুপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পাণিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু দলেই এদের পৌঁছে না, পুকুর পাড়ে এরা গুগলি শামুক এঁটোকাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক —এরা আসলে দিশি কালো কাকেরই বংশ, কিন্তু বঙ বদলে সাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে—এদের কারু গলা সাদা, কারু ডানা সাদা, কারু মাথা সাদা, এখনো দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে। পৃথিবীর আদিকাক ভুষুণ্ডিকাক, তারি বংশ ভুষুণ্ডে বা ভুষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই কাকের বংশ চলে আসছে—এদেরই পূর্বপুরুষ রামেব সঙ্গে লড়ায়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বলাতে চাচ্ছে এদেরই একজন, আসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব ভুষুণ্ডি। এইসব নানাধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাকসমাজকে সে নিজের মতো ভালোমন্দ নরম গরম ভাবে চালায়, এই হল সমাজের নিয়ম।'

অতঃপর, অবনঠাকুর বিবরণ দিয়েছেন, রাজবংশী ঢোঁড়াকাক থাকাকালীন কাকসমাজের ভদ্র থাকার কথা। কিন্তু কাকেদের সমাজে প্রজা বৃদ্ধি হেতু বিশৃঙ্খলা তৈরি হল। একদিন ঢোঁড়াকাককে বিতাড়িত করে ডোমকাককে সর্দার করা হল। 'পুরনো দলপতি ধোড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়া গাছের ডালে দিন কাটায়... নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরা-কাক, দেশের লোক তাকে বললে ঢোঁড়াকাক।' কিন্তু এই ডরাকাক বা ঢোঁড়াকাকই একদিন কুঠিবাড়ির

মধ্যে যাবার রাস্তা করে এল। এই অসমসাহসী কাজে তাকে নতুন দলপতি ভয় করে খাতির করে চলত।

এদিকে রিদয় যে ঝড়ে যোগী-গোফায় আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ঝড়ে কাটচিরার বহুকালের পুরনো শ্যাওড়া গাছ গোড়া শুদ্ধু উপড়ে যাওয়ায়, একটা গর্ত দেখা দেওয়ায় কাকেরা খেঁকশিয়ালের কাছে জানতে পারল, সেখানে সাত রাজার ধন আছে, যক ধরে আনলে যকের ধন পাওয়া যেতে পারে। যকের সন্ধান দিল খেঁকশিয়ালই। নাম বলল রিদয়ের। তিনকুড়ি কাক নিয়ে ডোমরাজা ঢোঁড়াকাক যক ধরতে গেল। কিন্তু এই রিদযের প্রত্যাশায় হাড়গিলেব রাজাও অপেক্ষমান। উপন্যাসের আখ্যান এভাবেই এগিয়ে চলেছে। শেষাবধি কাকেদের পাল্লায় রিদয়কে পড়তেই হল। ঢোঁড়াকাকেব পিঠে চেপে বসলেও তাকে তার ঢোঁড়াকাকের ডানাব থাপ্পড় খেতে হয়েছে। এবও পর উপন্যাস শুভ সমাপ্তিব পথে অগ্রসর হয়েছে। 'মাটি-মাঠ-নদী-বন-পাহাড় দিয়ে গড়া অপরূপ এক বাঙলা দেশের সঙ্গে' পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে, বুড়ো আংলা যক হয়ে যাওয়া রিদয়েব গল্প বলার সূত্রে কাকেদেব আশ্চর্য জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন অবন ঠাকুর। বুড়ো আংলা উপন্যাসে বিচিত্র কাক হয়ে উঠেছে এক-একটি চমৎকার চরিত্র। সুইডিস লেখিকা সেলফ লাগেরলফের লেখা *The Wonderful Adventures of Nils* বইখানির সৃজনধর্মী অনুবাদে বুড়ো আংলা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সৃষ্টি। প্রকৃতি, পশু, পাখির জগতের মুখোমুখি হয়ে আমরা ফিরে পাই বাংলাকে, বাংলার অন্য এক জীবনকে, সমাজকে। সেই জগতে কাক হয়ে উঠছে অনায়াস উপস্থাপনায়, মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতিতে, মানুষের কাছাকাছি অথবা মানবিক উপাদানের আকর।

সুকুমার রায়ের 'ড্রিঘাংচু' ও 'হযবরল'-য় কাকের ব্যবহার অসামান্যতায় বিশিষ্ট। একালেব সমালোচক 'ড্রিঘাংচু' সম্পর্কে বলবেন গল্পে আজগুবি রসের কাহিনীতে অসংলগ্নতার প্রশ্নে, 'আজগুবি রসের কাহিনীতে যে অসংলগ্নতা যুক্ত হচ্ছে, তা আসলে লেখকের সচেতন সতর্ক মনের সুবিন্যস্ত প্রকাশ, যেমন সাহিত্যে অসংলগ্নতা দ্বারা রস সৃষ্টি করছে, সেই সব মূলত পাগলের নয়। যুক্তিবদ্ধ বাক্যবিন্যাসের বৃত্ত ডিঙিয়ে তিনি আসলে এক ধরনের মজাই সৃষ্টি করতে চাইছেন। 'ড্রিঘাংচু' গল্পে সুকুমার রায় এই মজাকে পুরোদস্তুর ধরতে পেরেছেন।' গল্পবস্তু বলাব আগে, এই সমালোচকের এই মন্তব্যটুকুও উল্লেখযোগ্য, 'এখানে ভীষণ প্রস্তুতিপূর্ণ সাড়ম্বর রাজসভাকে প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে সামান্য কাকের একটি শব্দ। রাজসভারূপ যাবতীয় প্রচলিত

সাম্মানিক প্রতিষ্ঠানের অনেকাংশিক অন্তঃসারশূন্যতাকেই কি লেখক এখানে ধরতে চান নি? শেষ পর্যন্ত কোথাও অবশ্য সুকুমার স্পষ্ট করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। বললেই বরং গল্পটির সূক্ষ্ম রসের হানি হত।' [কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী: 'সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ']।

আমরা এখানে গল্প বস্তুটুকু বুঝে নিতে চাই। গল্প শুরু হয়েছে এভাবে, 'এক ছিল রাজা।' সেই রাজার সভায় একদিন হঠাৎ একটি দাঁড়কাক উঠে এসে শব্দ করল 'কঃ'। রাজসভা চমকিত হল। রাজা ডাকলেন জহ্লাদকে। মাথা কেটে ফেলতে বললেন তার, যে-এমন বিটকেল শব্দ করেছে। কাক উড়ে পালাল। রাজা কারণ খুঁজতে চাইলেন। কেন কাক সভায় এমন গোল বাধাল। কেউ বলতে পারছে না। এমন সময় এক রোগা সুঁটকো মতো লোক এসে জিজ্ঞাসা করল 'মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল?' সবাই হাঁ-হাঁ-হাঁ করে বলল, কেন? সে আবার শুধালো, 'মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নিচু করে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল?' সকলে যখন বলল ঠিক, ঠিক—তখনি লোকটি খানিকটা কেঁদে বলল, 'দ্রিঘাংচু'। মন্ত্রী এবং রাজা শুধোলেন, সে কি রকম? লোকটি বলল, 'ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর বসে মাথা নিচু করে দক্ষিণ দিকে মুখ করে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।' পণ্ডিতরাও জানেন না। কিন্তু তার কান্নার কারণ কি এবং সে থাকলেই বা কি করত, রাজা শুধোলে, সে অভয় পেয়ে জানায়, সে একটি মন্ত্র জানে এবং দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে বলতে পারলে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটত। সেই মন্ত্রটি রাজা জানতে চান। লোকটি সাবধান করে দেয়, কেউ যেন এই মন্ত্র শোনে না, কোনো লোকের সামনেই এ মন্ত্র বলা যাবে না, কেবল দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে তার সামনে বলা যেতে পারে। রাজা দুদিন উপোস করে তিন দিনের দিন সেই মন্ত্র পড়লেন এবং দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন তাড়িয়ে সেই মন্ত্র শোনাতেন, কিন্তু দ্রিঘাংচুর সন্ধান পান নি। মন্ত্রটি ছিল:

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং

মুসকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

এই আজগুবি রসের গল্পে, 'দ্রিঘাংচু'র সন্ধান না পাওয়া যাক, পাঠক সমাজ আগ্রহী হয়ে ওঠে 'দ্রিঘাংচু'র অন্তর্বস্তু সন্ধানে। এই মন্ত্রটির দশ লাইনের পাঠান্তর পাওয়া যাবে সুকুমার রায়ের 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকের বৃহস্পতির মন্ত্র হিসেবে:

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তার কানামামা
চিনে বাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুসকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা'র চিহ্ন দ্রিঘাংচুতে নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটি আঁটোসাঁটো, গঠনগত সংহতিতে বিশিষ্ট হয়েই দাঁড়কাকের রহস্যসমাধানে স্থিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন, 'খাঁটি ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কোথায় বা কেন যে এর সার্থকতা এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্য সমষ্টির সামান্য অদলবদল করলেই কেন যে এর অঙ্গহানি হতে বাধ্য, তা বলা খুবই কঠিন। এর অনুকরণ চলেনা, এর বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া উদ্ভাবন সম্ভব নয়।' [ভূমিকা: 'সমগ্র শিশুসাহিত্য সুকুমার রায়']

'হ-য-ব-র-ল' গল্পে সুকুমার রায় আমাদের নিয়ে যান ফ্যানটাসির জগতে। এটিকে ননসেন্স গোত্রভুক্তও করা চলে। সত্যজিৎ রায়ের অভিমত, 'বাঙলা গদ্যে ননসেন্সের এই শ্রেষ্ঠ নির্দেশনটি নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের অ্যালিস দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানেও সেই ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সেই স্বপ্ন, সেই সব চেনা, অর্ধেক চেনা জানোয়ার ও মানুষের চরিত্র-মিছিল, ভাষা নিয়ে, সামাজিক আচার নিয়ে আইনকানুন নিয়ে সেই তির্যক রসিকতা, আর সবশেষে

ঘুম ভেঙে স্বপ্নের জগৎ থেকে সেই বাস্তবে ফিরে আসা। তফাৎ এই যে হ-য-ব-র-ল মেজাজে একেবারে ষোলো আনা বাঙালি; এতই বাঙালি যে অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনাই করা যায় না।' [ভূমিকা: 'সমগ্র শিশু সাহিত্য সুকুমার রায়']। আসলে এ গল্পে সুকুমারের সমাজ-সচেতন মনটি যে উঁকি মেরেছে, সে বলা বাহুল্য। 'উদ্দেশ্যহীন জীবনের তাৎক্ষণিকতা'ও এখানে প্রকট। এই গল্পে যদি সমাজসমালোচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা হলেও আমাদেব বিস্মিত হবার কারণ নেই। অথচ স্বপ্ন-প্রক্রিয়ায় গল্পটির শুরুতেই জানতে পারি, 'ছিল রুমাল হয়ে গেল একটি বিড়াল।' যদিও গল্পে দাঁড়কাক স্লেট পেনসিল নিয়ে হিসাবনিকাশে ব্যস্ত। গল্পের বুড়ো যখন গল্প বলছে এমন সময় কাকের কাছ থেকে গল্পের কথক পেলেন একটি বিজ্ঞাপন:

শ্রী শ্রী ভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারী, সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য ইঞ্চি ১।/০। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতোর মাপ, গায়ের রং, কান কটকট্ করে কিনা, জীবিত কি মৃত ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাকের এই হিসাবের জটিলতা গল্পের কথকচরিত্র বোঝে না। কাকের হাতের স্লেট পড়ল বুড়োর টাকে। বুড়ো জুড়ে দিল কান্না। শ্লেটে দেখা গেল খুদে খুদে অক্ষরে—'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকলতনামা লিখিতং শ্রী কাক্কেশ্বর

কুচেকুচে কার্যঞ্চাগে।' তারও সঙ্গে আরও কিছু আবোলতাবোল লেখা। অতঃপর গল্পসূত্রে, বুধো, শ্রীব্যাকরণ শিং, উধো, হিজিবিজবিজ, হুতোম প্যাঁচা, কুমির, শেয়াল, সজারুর হাট বসে গেল। 'এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি কবছে, এখন সময় হঠাৎ দেখি কাকেশ্বর ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে গিয়ে সাক্ষীর জাযগায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, শ্রীশ্রী ভুশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে, ৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়া পটি। আমরা হিসেবী ও বেহিসাবী খুচরা পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য—' এরপর শেয়ালের সঙ্গে কাকের কথোপকথন; বিচারসভায় কাক বলতে বলতে হঠাৎই জানায়, 'তাবপব একজন লোক ছিল, সে সকলের নামকরণ কবত—শেয়ালকে বলতো তেলচোরা, কুমিবকে বলত অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলত বিভীষণ—' বলতেই বিচারসভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে টপ করে কোলা ব্যাংকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচকিচকিচ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস হুস করে কাকেশ্বরকে তাড়াতে লাগল।' এই স্বপ্নাদ্য গল্পে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে 'কাকেশ্বর কুচকুচে'-র দেশীয়তাই বড় বিশিষ্টতা। শুধু প্রশ্ন জাগে, কাকেশ্বর কি গল্পের চরিত্র, না কি আমাদের সমাজের চেনাজানা কোনো মানুষের চরিত্র?

বস্তুত পক্ষে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবন ঠাকুর বা সুকুমার রায়ের অসামান্যতা প্রকাশিত নির্মল হাস্যরসের মোড়কে। এই হিউমার বা কৌতুকহাস্যরসে সিক্ত রাজশেখর বসু বা পরশুরামের গল্পও। শুধু হিউমার কেন, ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসেরও সন্ধান মিলবে তাঁর গল্পসমূহে। তিনি যেভাবে কাকপ্রসঙ্গ এনেছেন conservation of virtual বোঝাতে তা অতুলনীয়। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের ঐ অংশটি এই গ্রন্থের অন্যত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে পুনরুক্তি এড়ানোর জন্য আর তা উদ্ধৃত হলো না।

রাজশেখর বসুর 'দাঁড়কাগ' গল্পটিও কৌতুকরসাশ্রিত, কিন্তু এই গল্পে একটি জীবনসত্যও পরিস্ফুট হয়েছে। শম্পা সেন, তমিস্রা নাগ ও উদীয়মান ব্যারিষ্টার কাঞ্চন মজুমদারের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গল্পরস জমে উঠেছে। কাঞ্চন মজুমদার তার যোগ্য পাত্রী খুঁজছে। কাঞ্চন যে দাম্ভিক, তা বন্ধুমহল স্বীকার করে। গণেশমুণ্ডায় সে বাজিয়ে নিতে চায় শম্পা সেনকে। ডায়েরীতে লেখে, 'তুমি

সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে। মনে হচ্ছে তুমি একটু অহঙ্কারী, মানুষ চেনার শক্তিও তোমার কম।' শম্পা সেন তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যতীশ বলেছিল, 'শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি গণেশমুণ্ডায় দাঁড় কাগের ঠোক্কর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে। স্বভাবতই উপেনেব প্রশ্ন ছিল, 'দাঁড়কাগটি কে?' যতীশ জানায়, 'সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিকের সময় নিজে নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আব শ্রীহীন সেজনো লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।' তমিস্রার চেহারার জন্যই 'পাড়ার বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাতে, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত 'দণ্ডবায়স হুশ'।' স্কটিশচার্চ থেকে আই.এস.সি, মাদ্রাজ থেকে বি.এস.সি. ও এম.এস.সি. পাশ করে গণেশমুণ্ডায় নারীউদ্যোগশালায় কাজ করে। 'খুব কাজের মেয়ে, তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিষ্টি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় অতি ব্রিলিয়ান্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা এখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআদিদি।...নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালোবাসে।' সকাল-বিকাল শম্পা ও তমিস্রার সঙ্গে ঘুরে প্রথমত শম্পার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং তারপরে তমিস্রার কাছ থেকেও সে চূড়ান্ত আঘাত পেয়েছে। পাত্রী হিসেবে কাঞ্চন তমিস্রাকে প্রথমে আমলই দেয় নি। কিন্তু তমিস্রাকে ফিকে নীল শাড়ি উপহার দিতে গেলে দাঁড়কাগ জানিয়েছে, এ শাড়ীটি শম্পার জন্য কেনা, সে হাঁকিয়ে দেওয়ায় এখন বিকল্পজনকে উপহার প্রদান। তমিস্রা কাঞ্চনকে বলেছে, বোকামি না করে কলকাতায় ফিরে যেতে। কাঞ্চনের বিয়ের প্রস্তাব সে অগ্রাহ্য করেছে।

'—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে, বন্ধুদের কি বলব? তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে না হয় রাজী হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কতদিন দাঁড়কাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ছাড়া কি মেয়ে নেই। যা বলছি শুনুন। —কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে

যান। আপনি হিসেবী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।'

সমগ্র নারী জাতির পক্ষে, দাঁড়কাগ অর্থাৎ তমিস্রা নাগের এই তিরস্কার যথাযথ হয়েছে। আত্মম্ভরী পুরুষ কাঞ্চন মজুমদারের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। এই গল্পে একটি মেয়ে দাঁড়কাগ সম্বোধিত হওয়ায়, শেষ অবধি তার দৃঢ়চিত্ততা ও সুবিবেচনা বোধের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ায়, দাঁড়কাক-চরিত্রের তাৎপর্যও বিস্তারিত হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়।

কিন্তু বুদ্ধিমত্তায়, অনুমানশক্তিতে, অনুপুঙ্খ অনুধাবনে পাখিসমাজের অনেককেই টেক্কা দিতে পারে সত্যজিৎ রায়ের 'কর্ভাস'। প্রোফেসর শঙ্কুর দিনলিপি থেকে পরিচয় পাওয়া যায় তার। 'সব পাখির মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা একটা কাক। দাঁড়কাক নয়, সাধারণ কাক। কাকটা আমার চেনা হয়ে গেছে। ডান চোখের নিচে একটা সাদা ফুটকি আছে সেটা থেকে তো চেনা যায়, তাছাড়া হাবভাবও অন্য কাকের চেয়ে বেশ একটু অন্যরকম। ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে আর কোনো পাখিকে দেখি নি।' ফলে নভেম্বর মাসে চিলির রাজধানী সানতিয়াগো শহরে সারা বিশ্বের পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে, মানুষের বুদ্ধি আয়ত্ত করাতে পারলেই প্রোফেসর শঙ্কু নিয়ে যেতে পারেন। ৪ঠা অক্টোবরের দিনলিপিতে লিখছেন, "কর্ভাস হল কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম। আমার ছাত্রটিকে আমি এই নামেই ডাকছি। নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইত, এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয়। এই প্রথম একটা কাককে 'কা' না বলে 'কি' বলতে শুনছি।' দুসপ্তাহের মধ্যেই কর্ভাস নিজের নাম ইংরিজিতে লিখতে শিখল — C-O-R-V-U-S। সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে, ইংল্যাণ্ডের রাজধানী কী জিগ্যেস করলে লিখতে পারছে, আমার নাম লিখতে পারছে।" প্রোফেসর শঙ্কু বুঝতেই পারছেন, কর্ভাসকে বৈজ্ঞানিক মহল উপস্থিত করা চলে। কর্ভাসের জন্য আলাদা খাঁচা তৈরি হয়েছে। ১০ই নভেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার দিন, তিনি লক্ষ্য করছেন, কর্ভাস ছটফট করছে। খাঁচা খুলে দিতেই 'সটান উড়ে গিয়ে আমার রাইটিং টেবিলে বসে ঠোঁট দিয়ে

উপরের দেরাজটায় ভীষণ ব্যস্তভাবে ঠোকা মারতে আরম্ভ করল। দেরাজ খুলে দেখি আমার পাসপোর্টটা তার মধ্যে রয়ে গেছে।'

সানতিয়াগো সম্মেলনে, প্রোফেসর শঙ্কুর বক্তৃতার সময় কর্ভাস অসাধারণ ডিমনস্ট্রেশন দিয়েছে। এখানকার কাগজ কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগোর সান্ধ্য সংস্করণে পেনসিল মুখে কর্ভাসের ছবি বেরিয়েছে। অতঃপর ঘটনা জমজমাট। চিলিয়ান জাদুকর আর্গ্রাস, হোটেলে এসে চড়া দামে, কর্ভাসকে কিনতে চেয়েছে। প্রোফেসর শঙ্কু নারাজ। কিন্তু হোটেলে, তাঁর অনুপস্থিতিতে, জাদুকর আর্গাস, খাঁচা সমেত কর্ভাসকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। তিনি বুঝেছেন কর্ভাসের প্রাণহানি হবে না। কেননা আর্গাসের লোভটা খাঁটি। কিন্তু কর্ভাস যে শঙ্কুব ছাত্রই নয়, সন্তানের মতো, বন্ধু ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণাব সঙ্গী। গ্রেনফেল, ক্যাবিরাস ও পুলিশ সহ সন্ধান করতে করতে আর্গাসের জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন তিনি। আর্গাসের হুঙ্কার, 'কোথায় গেল সে শয়তান পাখি? কর্ভাস! কর্ভাস! মূর্খ পাখি! শয়তান পাখি! নরকবাস আছে তোমার কপালে।' এরপর প্রোফেসর শঙ্কুর মারসেডিসের দরজায় আর্গাসের গুলি, তারপর আরো তিনটি গুলির শব্দ। পুলিশের কাছে আর্গাসকে আত্মসমর্পণ করতেই হল। কারণ আর্গাসের মাইনাস কুড়ি পাওয়ারের চশমা ছিল না তাঁর চোখে। গ্রেণফেল রাস্তার উল্টোদিকের নেড়া অ্যাকেসিয়া গাছটায় মাথার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন কর্ভাসকে। তারপর গল্প শেষ হচ্ছে এই ভাবে:

'উপরে চেয়ে দেখলাম — সত্যিই তো — আমার বন্ধু, আমার শিষ্য, আমার প্রিয় কর্ভাস গাছটার উঁচু ডালে বসে নিশ্চিন্ত ভাবে আমাদের দিকে ঘাড় নিচু করে দেখছে।

'তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই সে অক্লেশে গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মতো গাছের মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদের মারসেডিসের ছাদের উপর। তারপর অতি সন্তর্পণে — যেন জিনিসটার মূল্য সে ভালোভাবেই জানে — তার ঠোঁট থেকে তার সামনেই নামিয়ে রাখল আর্গাসের মাইনাস বিশ পাওয়ারের সোনার চশমাটা।'

পক্ষী মনস্তত্ত্ব ও মানবমনস্তত্ত্বের কোথায় কোথায় অভিন্নতা, একটি কাকের আচরণ, এমনকি তার যাবতীয় কার্যকলাপ কতটা মানুষের কাছাকাছিই নয়, মানুষের মতনই, তার দৃষ্টান্ত কর্ভাস। গল্পের বুনোনে প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব যেন 'কর্ভাস'-এ উপস্থাপিত।

কিন্তু সাতের দশক থেকে যেমন ছোটগল্প ও উপন্যাসে বিকল্পের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে, যেমন দেখাশোনা জগৎ থেকে, আগুন ও মাটি থেকে, মধ্যবিত্তের বাস্তব থেকে, গ্রামজীবনের অবতল থেকে উঠে আসছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বৃত্তান্ত, তেমনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হচ্ছে নতুন নতুন গল্প-উপন্যাস। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা বদলে যাচ্ছে। স্বপ্নের ধরণ বদলে যাচ্ছে। বিশেষত গল্পের মধ্যে বিষয়ব্যবহারের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটছে। কাক নিয়ে এই সময়কাল থেকে সাম্প্রতিক কাললগ্ন গল্পেও দৃষ্টির পরিবর্তন লক্ষণীয় বিশেষত্ব অর্জন করেছে। অনেক আগেই কাকমারাদের নিয়ে সুশীল জানার 'দেখল' পাওয়া গেছে, আবার পরবর্তীতে অনিল ঘড়াই-এর 'কাক'। তেমনি আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প—সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ষ্টীলের চঞ্চু', অভিজিৎ সেনের 'কাক' ভগীরথ মিশ্রর 'কাকচরিত্র', কিন্নর রায়ের 'নিখোঁজ', অশোককুমার সেনগুপ্তের 'কাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ঝড়ে কাক মরে', নবারুণ ভট্টাচার্যর 'কাকতাড়ুয়া'।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ষ্টীলের চঞ্চু' গল্পে বর্তমান সময়ের অন্তঃসারশূন্যতাকে ধরিয়ে দেয়, চিনিয়ে দেয়। কাক এখানে গল্প সূত্রে আসে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। কাক এখানে গল্প হয়ে আসে না। লেখক জানান 'সময়ের স্পর্শই বড় কথা। রুণু তার বাবা ও মা—একই ক্ষেত্রে, তবু ভিন্ন, দূরবর্তী, হয়তো পরস্পরে অনেক দূরের। ব্যক্তি চাহিদা, সমাজের গড়ন, সময়ের বিশ্বাস বদলে বদলে যায়। নবপ্রজন্মের চরিত্রের ভাবনা, যা তার বাবা বুঝতে পারে না, নতুন ধরনের—'সমাজ না পাল্টালে অসুখ সারে? মেলার মানুষ কোথায়? এরা সব অন্ধ, বধির। অতীত সম্পূর্ণ উপড়ে সব কিছু বদলে না দিলে শরীরের ময়লা যায় না। ঐ তো মরা গাছটার শুকনো, কঙ্কাল মাথায় কাকটা বসে আছে, কত দিন ধরে, মানুষগুলোর নজর পড়ে? আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। কী ভয়ঙ্কর বিপদ যে শিয়রে দাঁড়িয়ে, বোঝায় কার বাপের সাধ্যি। বলতে গেলেই আমার অসুখের প্রশ্ন তোলে। এতবড় বিশাল কাক সহসা চোখে পড়ে না। ঝিম কালো। সন্ধানী চোখ জোড়া সম্পূর্ণ বর্তুল। তীক্ষ্ন ষ্টীলের চঞ্চু। ঝকঝকে। রোদের ঝিলিকে চোখ অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি স্পষ্ট জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। চর্তুদিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। কঠিন চঞ্চুতে পেট, নাড়িভুঁড়ি চিরে, খুবলে শেষ করে দেবে। একটু আগেই বোধহয় ইঁদুর ধরেছিল, তাজা রক্তের দাগ। এখন খুঁজছে শিশুদের যকৃৎ।...এ সমাজে কিসের নিরাপত্তা আর আমার বাপ

ভূপতি ইঁদুরের মতো কেবল নিরাপত্তা খুঁজছে। মুখ তুলে কাকটাকেও দেখতে পায় না? অতবড় পাখিটা চোখ এড়ায় কি করে?' এই এক চরিত্র রুনু, অসুস্থ, ডিপ্রেশড তার ভাবনার সূত্রেই ধরা পড়েছে, কাক ধরা পড়ে না, বিপদ ধরা পড়ে না, কাকের মতই সমূহ বিপদ কেন যে কেউ ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না। ভূপতি বাঁড়ুয্যেকে সে চেনে, কিন্তু 'ওরা শুধু ছেঁড়া কাঁথায় তালি লাগাবার কথা বলে। সমাজের ওষুধের মূল খোঁজে না। সমাজ পুরো পাল্টে না গেলে কোনো কিছুর সমাধান হবে না। মাঝপথে কিছু নেই। ঐ কাক এবং ষ্টীলের ঝকঝকে চঞ্চুই তার প্রমাণ। অথচ মানুষগুলো অন্ধ।'

এই চরিত্রের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটছে না, না বাবা, না মা কারো সঙ্গে। পলিটব্যুরোর প্রেসিডেন্টই যথার্থ, খাঁটি কথার মানুষ সায়েন্টিফিক চিন্তার মানুষ: 'একবারেই আমি কত পরিবর্তন দেখলাম, চারদিকে। ঝড়। বৃষ্টি। তুষারপাত। কখনও রুক্ষ রোদ। ধু ধু বালি। কিন্তু আশ্চর্য, গাছের কঙ্কাল ডালে ষ্টীলের চঞ্চু নিয়ে কাকটি বসেই আছে। আলোক ঝিলিক মারে। রক্তপিপাসু দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে ডানায় ঘসে চঞ্চুটি তীক্ষ্ণতর করছে। অথচ কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ক্যাসেট, ওষুধ ছুঁড়ে ফেলা ভুল হলো বোধ হয়। ওগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখা দরকার। আমার নিজের কাছেই। ওগুলোর নিচে কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রাখব। অশুভ কাকটাকে তাড়াবো এবং ঘুম ভেঙে একদিন মানুষ বিস্ময়ে দেখবে সমাজটা পুরো বদলে গেছে।'

রুনুর সঙ্গে বিরোধে, তর্কাতর্কিতে ভূপতির হার্টের ইস্কিমিয়া বেড়েছে। অসুস্থ। চিকিৎসা ও বিশ্রাম প্রয়োজন। অ্যামবুলেন্সে ভূপতিকে নেওয়া যায় নি। রুণু ফিরিয়ে দিয়েছে। সে দেখতে চায়, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা কতটুকু সায়েন্টিফিক। টেনশনে রুনুও অসুস্থ বোধ করে। দুর্বল বোধ করে। ছাদে ওঠে। একাকী।

'...হঠাৎ নজরে পড়ে ঊর্দ্ধবাহু শুকনো গাছের কঙ্কালটায় ঝিম কালো কাকটি। অনড়। ষ্টীলের চঞ্চুটি ঝিকমিক করছে। অথচ এতগুলো মানুষ, ঐ দৃশ্যটা না দেখে, ছুটে এসেছে এখানে। এইসব নির্বোধদের মুখে ঠুকে দেওয়া দরকার!

নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, একাই সে চোখ, চঞ্চু ও পালক ছিঁড়ে অশুভ পাখিটাকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আকাশ বেয়ে উড়তে শুরু করে। পকেটে অস্ত্র আছে তার।

ছাদের মাথা থেকে টাল খেয়ে, জঙ্গল, খাসজমিতে, ধপাস করে কিছু পড়তেই তীব্র আর্তনাদ। পুতুল ছুটে বাইরে।

শুধু ভূপতি টের পায় হার্টে ক্রমাগত অসহ্য যন্ত্রণা।'

ব্যক্তির অসুখ। সমাজ ও সময়ের অসুখ। এমতাবস্থায় 'ষ্টীলের চঞ্চু'র তাৎপর্য গভীরতর। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন: ' সাধন ক্রমশ একাকী হয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। সমূহতে আর সেই সংযোগী উত্তরণের রাস্তা নেই, আবার নিজের বীক্ষা থেকে জানেন, দ্বন্দ্বময় ঐ ব্যক্তি ও বৃহত্তর সংযোগ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। এই সংকটে দেখান ব্যক্তিসমূহের সংযোগের ব্যর্থতায় কেমন এক ষ্টীলের চঞ্চুতে বিধ্বস্ত, যেন বা কোনো আততায়ীর সামনে।' [ভূমিকা: সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ ১]।

অভিজিৎ সেন 'কাক' গল্পে উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক বাস্তব, সমাজবাস্তব ও সময়ের বাস্তবকে। দশ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের যে জায়গা ছেড়ে এসেছিল, শঙ্কর ও বিনু চল্লিশ বছর বাদে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। বিনু যে গল্প বলছে তা নিছক এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার গল্প নয়, প্রকৃত পক্ষে দাস মশায়ের গল্প। অমর উদ্ভিদ কাফিলার ডাল কেটে বেড়া দেওয়া একখানি গেরস্থ বাড়িতে উপস্থিত। সামনে বড় ভিটা। ভিটার দুই প্রান্তে দুই বাড়ি। 'দুই বাড়ির দুই উঠোনে দুই বৃদ্ধ কাকেদের ডেকে ডেকে খাওয়াছে। যত তারা 'আয়-আয়' করছে, কাকেদের কা-কা ধ্বনিতে উৎসাহ যেন তত বাড়ছে। বন্দরের যত পাতিকাক সব থেকে এসে ভিড় করেছে এ বাড়িতে।' এবং 'যেন একে অন্যের কাকদের ভাগিয়ে নিজের উঠোনে নিয়ে ভেড়াবে।' আশ্চর্য এই দুই বৃদ্ধ। দাস মশায় ও মাণিক বাই। দুজনে যত মিল তত ঝগড়া।

'শঙ্কর কিছু একটা কথা তোলার উদ্দেশ্যে বলল, মানিক বাই, আপনাগো কাউয়াগো খবর কি?

মানিক জানালেন, এখনো তিনি 'ফার্স্ট'। তাঁর দখলে এখনো সাড়ে তিনশো কাক এবং তাঁর প্রতিপক্ষের দখলে শতখানিকেরও বেশি হবে না।

দাস মশায় সরোষে বললেন, ওর কথা বিশ্বাস করিস না, শঙ্কর। এক নম্বরের মিথ্যুক আর ওর কাউয়াগুলাও নিপিতইয়া কাউয়া। এই উঠানের চাউল খাইয়া ওই উঠানে গিয়া মুসলমানের ভাত খায়।

মানিক বললেন, ঠিক ওরই মত, খাইবে হাগবে এই দ্যাশে, আর মন

পড়ইয়া থাকে ওই দ্যাশে। গেছিলো তো কইলকাতায় ভাইগণাদের কাছে—খাওয়ায় নাই হেরা। দ্যায় নাই থাকার জাগা।'

এইভাবে কাক নিয়ে বিবোধ বাড়াতে থাকে অন্যত্র। আবার খিল। কাক নিয়ে বেষারেষি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

'দাস মশায়ের আবো বক্তব্য, তিনি তো আর মুসলমানেব মত সারা বাড়িতে ভাত ছড়াতে পারেন না। তাঁর তো একটা ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে। আর ভাত ছড়ালেই তো কাউয়া বেশি যাইবেই।'

সুযোগ পেয়ে আমি বলেছিলাম, 'ওই কাকেদের মধ্যেও হিন্দুমুসলমান আছে নাকি দাসমশায়?'

দাস মশায় আমাব দিকে তাকিয়ে মুখখানাকে বিচিত্র বকমের গম্ভীর করে বলল, থাকতে পারে, আশ্চর্য কি! না হইলে ওইরকম নৃশংস মারামারি করে? কাউয়াদের মারামাবি তুমি দ্যাখছ? একেবাবে একে অন্যরে শ্যাষ কবাইয়া ফ্যালতে চায়। হিন্দুমুসলমান না থাকলে এরকম হয়?'

একদিকে অকৃতদাব দাস মশায়। অন্যদিকে মানিক মিঞার সংসাবে তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, চারটি নাতিনাতনি। বড় ছেলে ববিশালে। দুই সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে থাকে। সেখানেই তার চাকবি। ছোট ছেলে ঢাকায়। মেজ ছেলে জাহেদ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আলাদা থাকে। 'মানিক মিঞা এবং রাঙ্গাদির সংসারে দাস মশায় তৃতীয় ব্যক্তি। দাস মশায়ের ধারণা, 'হিন্দুস্থানে তো ব্যাবাক মুসলমান। সেখানে তো দ্যাখলাম হিন্দুগুলাও মুসলমান হইয়া গেছে।' তাঁর মতে, 'আসমান এবং মুসলমান—একেবারে বিশ্বাস নাই।' এ হল মানিক মিঞাকে খোঁচা। হিন্দুস্থানে হিন্দুদেরও মক্কা আছে। 'মানিক মিঞা যেমন সারাজীবন তার সঙ্গে একত্রে থেকেও পরামর্শ নেওয়ার বেলায় অন্য কোনও মুসলমান মুরুব্বির কাছে যাবে।' হিন্দুস্থানে হিন্দুরাও এককাট্টা, মন্দির নামক সংঘ ভোটেও নানা-ভাবে অংশগ্রহণ করে। হিন্দুরা সব এককাট্টা, যারা চিরকাল নিজেদের মধ্যে বিরোধ করত, এখন এক সঙ্গে ধর্মকর্ম কবে, এর থেকে অধর্ম কি আছে?' দাদা মশায় বিভ্রান্ত। শঙ্কর মানিক মিঞাব স্ত্রী জামিলাকে ডাকে রাঙাদি। জাহেদকে এখন ছায়েদ না বললে, সাড়া পাওয়া যায় না। রাঙাদি অভিযোগ। রাঙাদির কাছে শঙ্করের সরাসরি প্রশ্ন 'জাহেদের বাপ কেডা?' বিনু শঙ্করের কাছে জানতে পারে জাহেদের পিতৃত্ব দাস মশায়েরই। এই জাহেদই ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিয়েছে, উগ্র মোল্লাতন্ত্রী হয়েছে।

অথচ নাসিরকে, রাণীর ভাই সুজনকে, পাকিস্তানীরা গুলি করে মেরেছে। শঙ্কর বেদনার্ত হয়। বিনু বলছে : 'আমি আর কোনও কথা বললাম না। বাতাসের টানা শব্দ ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠছে। তার সঙ্গে ঝড়ে শাখা চ্যুত কোনও পাখি 'অ-হা-হা-হা' করে বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল। ঝড়ের বড় একটা ঝাপটায় এক সঙ্গে অনেকগুলো কাক গাছের আশ্রয় হারিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ভারি বিপন্ন তাদের কণ্ঠস্বর। তারা দাস মশায়ের কাক না মানিক ভাইয়ের কাক, এরকম একটা হিসাব আমার মগজে জুড়ে বসে বাকি রাতের ঘুমটুকু কেড়ে নিল।'

কাককেন্দ্রিক ভাবনার আবর্তে হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের জটিলতা ও সত্যরূপ ফুটে উঠেছে 'কাক' গল্পে। অভিজিৎ সেনের 'কাক' গল্পটি এক আশ্চর্য রূপক। সমালোচক চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, "মানিক মিঞা ও দাস মশায়ের কাকের হিসেবে ইতিহাস যেমন চমকায়, তেমনি দাস মশায়ের হিন্দুস্থান থেকে চলে আসা—'সেখানে তো ব্যাবাক মুসলমান', মুসলমান শব্দটিরই অর্থান্তর ঘটে যায়। মানিক মিঞা-রাঙাদির ঘর তো নিতাই দাস-গৌর দাসের। জাহেদ যে আজ প্রবল হিন্দুবিরোধী, সে দাস মশায়েরই সন্তান—নাসির ও সুজন দুজনেই মারা গেছে একান্তরে গুলিতে—এসবই রচনা করে সম্পর্কের ইতিহাসকে যা কোনো টাইপে আবদ্ধ নয়; গল্পটি হয়ে ওঠে ইতিহাসের জটিল প্রতিরূপ; বিপন্ন বাস্তবের সামনে কাক দাস মশায়ের না মাণিক ভাইয়ের এ-প্রশ্ন রাতের ঘুম কাড়ে। এ বিষয় নিয়ে এমন গল্প কমই লেখা হয়েছে।"

ভগীরথ মিশ্র'র 'কাকচরিত্র' গল্পে খোঁড়া কেশব, গয়ানাথ ও ভানুমতীর কথা বলা হয়েছে। এ-গল্পে মুখ্যত কাকের চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু লেখকের মতে, এটি আসলে ভানুমতীর গল্প। চাঁদাবিলার ভানুমতী। স্বামী গয়ানাথ। খোঁড়া কেশবের পুরনো ভিটেয় থাকে। এ গল্পে কাক যেমন চরিত্র, তেমনি বীরসাধনা বা কাকসাধনাও প্রাধান্য পেয়েছে পুরোপুরি। ফুটে উঠেছে প্রত্যেক চরিত্রের মনস্তত্ত্ব। কাক নিয়ে ভানুমতী ব্যতিব্যস্ত। উঠোনে ধান শুকোতে দিয়েছে। ধান শুকোলে তুলে নেবে। চুলার পেটে আগুন ধরেনি। তার পেটের মধ্যে সাত মাসের পুতুল নড়াচড়া করে। কাক তাড়িয়ে দিতে চাইলেও পারে না। "কাক নিয়ে ভানুমতীর মনের মধ্যে একটা চাপা ভয় অনেক দিনের। কেশব লোহার খোঁড়া ছিল। সে নাকি কাক-চরিত্র জানত। কাকেদের হাজার ভাবগতিক তার নখদর্পণে। সে নাকি কাকের ভাষাও বুঝত।

ঐ দিয়ে সে মানুষের ভূত-ভবিষ্যত সব নাকি নির্ভুল বলে দিতে পারত।" বীর সাধনা করতে গিয়েই ক্ষণিকের ত্রুটিতে কেশবের মতে, তার পা খোঁড়া হয়েছে। সে ভানুমতীর হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করত: অথচ হাত দেখতে জানে না। তার হলো 'কাকচরিত্র'। "খোঁড়া কেশব বিশেষ করে বলত তার সাধনার কথা। কাকসাধনা। কাক নিয়ে হাজার গল্প শোনাত! কাক ভারি রহস্যময় প্রাণী। ছদ্মবেশী মহাকাল। সর্বদা অমঙ্গল আর মৃত্যু ঘোরে ওর পিছু পিছু। তবে সাধনায় বশ করতে পারলে সে হবেক ত্রিকালদর্শী। তুমার দাসানুদাস। তুমার আজ্ঞায় অসাধ্যসাধন করবেক উ। খোঁড়া কেশবের চোখমুখ চকচকিয়ে ওঠে। একটিবার কাকসিদ্ধ হতে পারলে কি সব অলৌকিক কান্ড ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব! শুধু মুখ থেকে বচন খসা মাত্তর এ দুনিয়াকে সোনা দিয়েই মুড়িয়ে দেওয়া যায়! আবার পুড়ে ছাইও করে দেওয়া যায়।"

অনেক আগে ভানুমতী ছিল সোনার সংসারের স্বপ্নে বিভোর। খোঁড়া কেশব তার সাধনায় ভানুমতীকে ভৈরবী রূপে পেতে চায়। ভৈরবীই সাধনার আধার। ভানুমতী কয়েক বছর খোঁড়া কেশবের কাছে বসেছে। একাসনে বসেছে। একদিন খোঁড়া কেশব দাঁড়কাক ধরে নিয়ে এসেছে। কুচকুচে কালো। ভানুমতী ভেবেছে 'ভুসুণ্ডী কাক'। কাকটির সঙ্গে তার ভাব হয়ে যায়। খোঁড়া কেশবের কাকসাধনা চলতে থাকে। খাঁচা থেকে বের করে একদিন গর্তের ভেতর সেই কাককে ভয়াল পরিবেশে, নামিয়ে দেওয়া হয়। 'তার চঞ্চু সহ মুণ্ডুখানা জেগে উঠেছে আলোয়। অবশিষ্ট শরীর খানা ডুবে গেছে গাঢ় আঁধারে।' ভানুমতীর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। 'মাটি দিয়ে গর্তখানি বুজিয়ে তার ওপর বাঁশের ত্রিশূল পুঁতে দেয় খোঁড়া কেশব। পদ্মাসনে বসে। ভানুমতীকে তুলে নেয় কোলের ওপর।' এহলো তার কাকসাধনা। এর আগেও ভানুমতীকে দু চারবার কোলে চড়িয়েছে। বুঝিয়েছে, এ হলো 'মনের জোর বাড়ানো, বুঝলি। ডবকা মেইয়া-ছেইলাকে কোলে নিয়েও মন থাকবেক অচঞ্চল। বাতাস-বিহনে পিদ্দিমের আলো যেমন। সাধনা অত সোজা লয়।' কেশবের কোলে সুস্থিরে থাকে না ভানুমতী। উসখুস করতে থাকে। কিন্তু সোনার সংসারের লোভ সামলানো যায় না। খোঁড়া কেশব ভানুমতীকে আশা দেয়, 'সারা জীবন তুয়াকে কোলে রাখলাম ম্যুই।'

গয়ানাথের সারা অঙ্গে দাদ ভরা। তাকে কেশবই নিয়ে আসে, বিয়ে দেয় ভানুমতীর সঙ্গে। গয়ানাথ নিজের মতো ক্ষেতে-খামারে খাটে। ভানুমতীর

দোরে থেকে যায়। ভানুমতীও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। "ল্যাংচানো তেঁতুল গাছের তলায় ফি-অমাবস্যায় আর শনি-মঙ্গলবারে হাজির হতে হয় ভানুমতীকে। গভীর রাতে। এখন কেবল কোলে বসে থাকলেই চলে না। নানারকম জৈবসাধনারও সঙ্গিনী হতে হয় ভানুমতীকে। বিভিন্ন মুদ্রায় রতিক্রীড়া, সেও নাকি সাধনার অংশবিশেষ। রতিক্রীড়ার আগে ভানুমতীকে কিছু মন্ত্রপূত শেকড়-বাকড় বেটে খাইয়ে দেয় খোঁড়া কেশব। বলে, এই প্রসাদী শিকড়ে সঙ্গিনীর শরীরে রতিক্রীড়ার কোনও ফল ফলবেক নাই।....রাতভর খোঁড়া কেশবের সাধনসঙ্গিনী হয়ে শেষরাতে ঘরে ফিরত ভানুমতী!" সে গয়ানাথের অকর্মণ্যতাকে ধিক্কার দেয়। অতঃপর কেশবকেও তিরস্কার করে গয়ানাথ, 'আরে যাও হে কুটুম। সাধনার বহর তুমার জানা আছে। খালি পরের মেয়াকে লিয়ে — '। কেশব বোঝে, 'গয়ানাথের ভিতর থেকে ভানুমতীই বলছে এ-সব।'

ভানুমতীর উস্কানিতে কেশব গ্রাম ছাড়া হয়। ভানুমতী কাক দেখলে ভয় পায়। পঞ্চমীর চাঁদে যেদিন ফিং ফুটেছে, সহসা ভানুমতী, গয়ানাথের সঙ্গেই দেখতে পায় ঘরের চালে কাকটিকে। হুশ হাশ করলে কাক যায় না। গয়ানাথ বাঁশের মই লাগিয়ে ঘরের চালে ওঠে। কাকটা উড়ে গেলেও গোটা চারেক মেটে সাদা ডিম দেখতে পায় সে। একটা ডিম সযত্নে তুলে ভানুমতীকে দেখায়। যেন ভানুমতীর 'বহুদিনের একটি গোপন স্বপ্ন গোলাকার হয়ে শুয়ে রয়েছে তারই ঘরের চালে। খড় কুটোর মধ্যে। দেখতে দেখতে এক সময় খিলখিলিয়ে হেসে উঠল ভানুমতী।' কাকের ডিম ও ভানুমতীর সাত মাসের পুতুল বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কাক-চরিত্র জানা-কেশবের চরিত্র উন্মোচিত হয় এখানে। জানা যায়, কাক সাধনার পদ্ধতি। সমগ্র গল্পে খোঁড়া-কেশব-ভানুমতী-গয়ানাথের সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, ভানুমতীর পরিণামও সুচিহ্নিত হয়ে যায়।

পুলিশের হাতে ভিখারি পাসোয়ানের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার গল্প কিন্নর রায়ের 'নিখোঁজ'। নিখোঁজ গল্পে সে হয়েছে বাঙালি পাসোয়ান।

এ গল্পের সূত্রপাতে লেখক পৌরাণিক রেফারেন্সে জানিয়েছেন কাকভুশুণ্ডীর কথা। সুধীরচন্দ্র সরকারের 'পৌরাণিক অভিধান' থেকেই তাঁর এই উদ্ধৃতি: 'কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভুশুণ্ডীকে যুদ্ধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছিল, সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে বিনা আয়াসে সে দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করেছিল। ত্রেতাযুগে লঙ্কাযুদ্ধে তাকে অল্প পরিশ্রম

করতে হয়েছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তার কষ্টের সীমা ছিল না।' কিন্নর রায় গল্প শুরু করেছেন, 'এভাবেই পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে কাকভুশুণ্ডী উড়ান দিয়েছিল। তার কাছে মাংসের খবর ছিল। সঙ্গে অনেকটা রক্তও।" ওড়িশার আকাশ পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরের শহরটিতে এসেই সে জানতে পারে বাঙালি পাসোয়ানের নিখোঁজ হওয়ার গল্প। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে সে নিখোঁজ। এভাবেই কেরলের রাজন হারিয়ে যায়। 'আর সেটা জানাজানি হওয়ার পর রেজিগনেশন দিলেন কেরালার তখনকার মুখ্যমন্ত্রী করুণাকরণ। রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ রাজন। পদত্যাগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী — সময় বলে যাচ্ছিল। 'একই ভাবে ১৯৭১-এর ৪ঠা আগস্ট সরোজ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, আর ৫ই আগস্ট কলকাতার ময়দানে তাঁকে নামানো হয়, গুলি করা হয়, তারপর তাঁরও লাশ নিখোঁজ। বাঙলা সিনেমার 'মহানায়ক'-এর চোখে পড়েছিল ঘটনাটি। কিন্নর 'নিখোঁজ' বাঙালি পাসোয়ান বা ভিখারি পাসোয়ানের পাশে অসামান্য নিপুণতায় এঁকেছেন রাজন বা সরোজ দত্তকে। এ-গল্পে কাক-ভুশুণ্ডীর চোখ দিয়ে মন দিয়ে ভাবনা দিয়ে, সময়ের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে কিন্নর গভীর ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করেছেন চাপা সন্ত্রাসকে, সমাজ ও সময়কে।

চটকলের অনেক কাকেদের সঙ্গে কাকভুশুণ্ডীও মিশে যেতে চায়। প্রথমে কাকেদের আপত্তি ওঠে! গায়ে ডানায় পাথর পাথর গন্ধ। ভুশুণ্ডীর স্মৃতি সূত্রে কিন্নর গাল নামক রাজা ও ইন্দ্রদ্যুম্নের সংঘর্ষের কথা বলেন। 'কাক ও কচ্ছপ উভয়ে ব্রহ্মার নিকট উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের প্রতিধ্বনি হয়।' এই গল্পসূত্রে 'নির্বাণ' শব্দে ভুশুণ্ডীর শব্দের উৎসে যেতে চায়। ভুশুণ্ডীই অতঃপর মনে করে স্কন্দ পুরাণের উৎকলখণ্ডের কথা। ভুশুণ্ডীর আরো মনে পড়ে ওড়িয়াতে লেখা 'দেউলতোলা' বইটির কথা। পাতিকাকদের কথন সূত্রে অজয় হোমের 'বাঙলার পাখি'-র কথা। কিন্নর মূল গল্পের কাহিনীবস্তুকে বিস্তারিত ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন এই সব রেফারেন্সে। এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য কথাকার যে মানবিক অভিজ্ঞান থেকে, সমাজসচেতনতা দিয়ে গভীর সহানুভূতি দিয়ে মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে শিল্পকুশলতায়, তাতে বলা যায়, এমন গল্প রচনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

কাকভুশুণ্ডীকে যে আঙ্গিকে এখানে রূপায়িত করেছেন তাতে মনে পড়ে যাবে, অবন ঠাকুরের কথা, বুড়ো আংলার কাকেদের কথা। তাকে ঘিরে

আবারও চটকলের কাকেরা বারেবারে জানতে চাইছিল তার দাঁড়কাক, ডোমকাক, কৃষ্ণোত্তোমাঙ্গ কাক, পলপ্রিয় কাক, সংঘচারী কাক ও চোরকাকদের সঙ্গে আলাপ আছে কিনা?

ভুশুণ্ডী ঘাড় নাড়ল, আছে।

দলবাঁধা পাতিকাকরা শুনে অবাক হল। আছে! বলে কী? ডোমকাক থাকে পাকিস্তান, পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলে। এদের কোনো জাত-বেরদারকে দেখা যায় তিব্বতে। কৃষ্ণত্তোমাসু কাক বেশির ভাগই দেখা যায় তিব্বতের লাডাকে। ভারতে খুব কমই আসে তারা। পলপ্রিয় কাকেরা থাকে কাশ্মীরে। সংঘচারী-কাক পাঞ্জাব আর কাশ্মীরে ওড়াউড়ি করে।

চোরকাক লম্বায় ১৩ ইঞ্চি। কাকেদের ভেতর বেশ ছোট। বলতে বলতে ভুশুণ্ডী চোখ বুঝল।"

রিপোর্টাজের ভঙ্গি ভেবে নিয়ে কেউ যদি 'নিখোঁজ' গল্পের অন্তর্বস্তু সন্ধান করেন, তাঁকে বিভ্রান্ত হতে হবে। এ গল্পে কিন্নর যেভাবেই রেফারেন্স উপস্থাপন করুন না কেন, এর গল্পরস অসাধারণ। গল্পের সত্যে সমাজসত্য ফুটে উঠেছে। গল্পবস্তু হয়ত খুব বেশি নয়, ব্যাপক নয়। পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় হয়ে যাওয়া পুলিশী সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত ভিখারি পাসোয়ানকে ধরে নিয়ে যাওয়া ও আজ পর্যন্ত তার হদিশ না পাওয়া। পি.ডি.সি.এল. মামলা, এ.পি.ডি.আর. সংবাদপত্র, জনসভা, প্রতিবাদ—সবই হয়েছে। কিন্তু ভিখারি পাসোয়ানের সন্ধান মেলেনি। গল্পেও মেলে নি সন্ধান বাঙালি পাসোয়ানের। 'পুলিশ যায় নি বাঙালি পাসোয়ানের বাড়ি। তাকে গ্রেপ্তারও করা হয় নি। ঘোরানো চেয়ার, কাঁচ ঢাকা বড় টেবিল, জোরালো টেবিল-আলো, দেয়ালে টাঙানো কাঁচ বাঁধানো বড় জিভ বের করা কালী—মোটা মোটা ফাইল, পিন কুশন, পেনষ্ট্যান্ড, পেপার ওয়েট সবাই একই কথা বলতে থাকে। আমার বাঙালিকে গ্রেপ্তার করিনি।' অনসূয়া আর নেমিচাঁদ পাসোয়ানের খোকা বাঙালিকে কি তাহলে সত্যি সত্যি বস্তায় পুরে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। —থাক না সেসব কথা। এসব বলতে বলতেই নদী বয়ে গেল। তার জলে সকাল-সন্ধ্যের ছায়া পড়ে। মিশে যায় কারখানার কালি। তবু ভুশুণ্ডী থামতে পারে না।' ভুশুণ্ডীকে যারা কর্ভাস কিনা জানতে চেয়েছিল, চটকল পাড়ার পাতিকাকেরা জিপের হেড লাইট নিভে যেতে দেখেছিল বাঙালির ঘরের একটু আগে, 'তারা ভুশুণ্ডীর পেছন পেছন এসে কাঁচের গায়ে ঠোঁট ঘষে আর ডানা

ঝাপটায়। ডানা ঝাপটায় আর ঠোঁট ঘষে।' আমরা লেখকের যন্ত্রণা বুঝি, মানতে পারি তাঁদের কেন বলা হয় সমাজের বিবেক। তাঁর ধিক্কার যেন প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধিক্কার। সেই সব কাঁচ ঘেরা ঘরে যারা বসে। তারা বলে, বাঙালিকে ধরার ব্যাপার নেই। 'সেই সব কাঁচ ঘেরা ঘরের ভেতর থেকে কোনো কথা শোনা যায় না। জল ছাড়া সেই সব অ্যাকোয়েরিয়ামের ভেতর মানুষরা কী কী যেন বলে। তারা যেসব বাণীর বুজগুরি কাটে তার মধ্যে কোনোটার নাম — মানবতা, কোনোটা মানবাধিকার, কোনোটা গণতন্ত্র।' কাকভুশুণ্ডিকে গল্পে ব্যবহার করে কিন্নর রায়, গল্পের সর্বাধুনিক গঠনকে রক্ষা করেই, একটি নির্মম সমাজ সত্যে আমাদের পৌঁছে দেন, তাঁর শিল্পস্বকীয়তার জোরে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'ঝড়ে কাক মরে' প্রবচনটিকে সামনে রেখেই গল্পের নামকরণ করেছেন। কিভাবে মরে তাও দেখিয়েছেন। গল্পের কথকের বেকার জীবনের পাঁচালি। তার মতি হয়েছে জেরক্স-এর বিজনেস করবে। লক্ষ্মণ, আশু, কানাই, ট্যারাবাচ্চু, অ্যাটম, চপলাপিসী, ছোটমামা — সকলের কাছে ঘুর ঘুর করে টাকা জোগাড় করে। মায়ের গয়না বাবদ আট হাজার টাকা পায়। বিজনেস শুরু। দোকান ওপেন, দেয়ালে মা কালী তাকে গণেশ।' পুজো দেওয়া হল। জেরক্স মেশিনের দরকার ছিল, এই মফস্বল শহরে, বোঝা গেল। চন্দনা খুশি। ব্যস্ততা বেড়েছে। কিন্তু অঘোরবাবুর ফালি জমিটায় নতুন নতুন দোকান ঘর উঠল। মুকুল শিকদার অটোমেটিক ক্যানন মেশিন বসিয়েছেন। স্পিড জেরক্সের গায়ে ৭০ পয়সা থেকে ৬০, ৬০ থেকে ৫০ পয়সা, ৫০ থেকে ৪০ পয়সা দাম কমাচ্ছে মুকুল শিকদার। এ প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা যায় না। সেল কম। মুকুলদা দাম কমানোয় অটল থাকেন। সারাদিনের কাজ ৬ টাকার জেরক্স। ব্যাঙ্ক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দেনা আর দেনা। মনে মনে ভাবনা, মুকুলদার দোকানেই কাজ নিতে হবে। সব দেনা শোধ করে দিতে শেষাবধি জেরক্স মেশিন বিক্রি করে দিতে হয়। ভুজঙ্গর কাছে বিক্রি হয়ে যায় মেশিন।

'বিসর্জনের পর শূন্য বেদিতে বসানো একাকী প্রদীপের মতো ওই ঘরে বসে থাকি নিশ্চুপ। শূন্য প্লাগ পয়েন্ট। তার। টুকরো কাগজ। কালির দাগ।

মুকুলদা এল। বলল, একবার আইসো আমার কাছে একটা দরকারি কথা আছে।'

এ গল্পে কাক নেই। স্বপ্নময় 'ঝড়ে কাক মরে' প্রবচনটিকে সমগ্রের নিরিখে, পরিপ্রেক্ষিতকে বড় করে ধরেই বোঝাতে চেয়েছেন। আর্থসামাজিক সমস্যার একটি সংকেতও এখানে তিনি দিয়েছেন।

অশোককুমার সেনগুপ্তর 'কাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' গল্পে গুপির বিদ্রোহ দেখিয়েছেন। বাটির ভিজে ভাতে কাক এসে মুখ দেওয়ায় ক্রুদ্ধ গুপী যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ দিল। পিতি ভাবল, তাকে গাল দিচ্ছে। পরে বোঝাপড়া হল। পিতি বলল, 'পুরুষ গাল দেয় না মারে। কেয়োট মারার মুরোদ নাই তোমার।' গুপী দেখল ঢিল মেরে কিচ্ছু হচ্ছে না। সে তীর ধনুক নিয়ে, লাকপুকুরের বাঁশঝাড়ের দিকে চলল। খাবার সময় কাকের উপদ্রব অসহ্য। যাবার পথে বিশু বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা। 'দশ বছর জমিটা বাবুর হাতে ছিল, বাবুই ভোগ করেছে। বছরের হিসেব করে তাতেই দেনা শোধ। খায় খালাসি বলে একে। দশ বছর পর বাবুর জমি ছাড়ার কথা। কিন্তু বাবু তাতে নারাজ। শালা আইনকানুন মানবে না।' বাবু কোর্টে যেতে বলে। জমি দখলের ইচ্ছা। হাতে তীরধনুক দেখে বিশু বাঁড়ুজ্যে ভাবে, খেপে গিয়েছে গুপী। সে বলে, 'দেখুন কেনে শালার জাত চাট্টি ভাত খেতে দিবেক না। ইকি সহ্যি হয়। শালার জাতের গুষ্টির চাদ্দ দুব।' তীরধনুক তার দিকে গুপী তুলতেই বিশু পালায়। অতঃপর সে কাক শিকার করে নিয়ে আসে। মহা আনন্দ তার। 'পিতিঃ দেখ! কেয়ো বটেই। শালা মেরেছি।' সে আমড়া গাছে কাকটাকে টাঙিয়ে দিতে চায়। পিতি বলে, 'উদের জাত এসে ছিঁড়ে খাবেক আমাদের। কেয়োর জাত বটেক।' গুপী খুশি, 'ঘরে বসে বসে শালাদের মারব।' গুপী যে আরও একটা তীরে আর একটা কাককে জখম করেছে, তা পিতিকে বলে না। তার হাতে থাকছে আটটা তীরই। 'কাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ'-র মূলে তার ভাত খেতে না পারা, আর ভাত থেকে বঞ্চিত হলে বিদ্রোহ মানুষের স্বভাবেই ঘটে যায়।

নবারুণ ভট্টাচার্য 'কাকতাড়ুয়া' গল্পে কাকতাড়ুয়াকে একটি চরিত্র রূপে এঁকেছেন। ১৯৭৯ সালে ১৫ আগস্ট বিহারে গম্ভীরা, গণপত রাম, নির্ভয় পাসোয়ান, ভারত বিন্দে—এঁরা ক্ষেতমজুর ও হরিজন নেতা। নিহত হয়েছেন জমিদার ও পুলিশ বাহিনীর হাতে। কাকতাড়ুয়ার দেখা ও জানার মধ্য দিয়ে নির্ভয় পাসোয়ানের হত্যা, ধর্মনাথ ঠাকুরের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর নিষ্ঠুরতা, দৌলতের গুলিতে কাকতাড়ুয়ার একটা চোখ ফুটো হয়ে যাওয়া এবং এক চোখেই দেখতে

পাওয়া, ক্ষেতমজুর ও হরিজনদের সংগঠিত হওয়া, বিক্ষোভ, ধর্মনাথ ঠাকুরেব ডালের আড়ত, মুদির দোকান ও কাপড়ের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, ঠাকুরের বড় ছেলেকে ফুঁড়ে ফেলা — এইসব, সব কিছু জানা যায় ; শ্রেণীসমাজে দলিত ও শোষিতদের শ্রেণীযুদ্ধে উদ্দীপ্ত হওয়ার তথ্যও গল্পে জানা যায়। লেখক লিখছেন, 'কাকতাড়ুয়ার গায়ে নির্ভয় পাসোয়ানের ছেলে তার বাবাব খাকি সার্টটা পরিয়ে দিয়েছে।' পুলিশের ট্রাক ও জিপের হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় 'খাকি সার্ট' পরা একচোখো কাকতাড়ুয়া দাঁত বার করে হি হি কবে হাসছে, তার জামাটা বাতাসে দুলছে। কাকতাড়ুয়ার ভোট নেই।' এই গল্পে কাকতাড়ুয়াকে সামনে রেখে লেখকের গল্পকথন পদ্ধতি আকর্ষণীয় এবং তীব্র সমাজমুখী মানসের অধিকারী লেখকের ঘৃণাও এখানে লক্ষণীয়।

বাবিদবরণ চক্রবর্তীর 'উর্বী' উপন্যাসে কাকের ব্যবহার আছে। উপন্যাসের শেষে সায়ককে উর্বী সাহায্য করতে বলছে। সায়ক জানতে চায়, কি ধরনেব সাহায্য। উর্বী বলে 'আমাকে মা করে দে।' এবং 'আমাকে জানতে দে দুনিয়াটা রাক্ষসের নয়। পশুদের নয়। খেয়েদেয়ে উল্লাসে আকাশ ফাটানোর জন্য জীবনটা নয়। — জীবনটা বারবিকিউ নয়। — জীবনটা ত্যাগের দানের তিতিক্ষার।' এর পরই গ্রিলে বসে কাকের কর্কশ ডাক সহ্য করতে পারে না উর্বী। 'সে শুধু কাকের থেকেও কর্কশতায় সায়কের উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠে, 'তুই কী রে সায়ক। কাকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারছিস না। দেখছিস না আমি কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছি। হতচ্ছাড়া কাকটা কীভাবে আমাকে তোর থেকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু 'কাক' যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা টের পাওয়া যায়, কাহিনীর মোড়কে রচিত বিমলেন্দু চক্রবর্তীর 'দিশাকাক' গ্রন্থে। বিজ্ঞাপিত হয়েছে এভাবে, 'কাক। হ্যাঁ, কাকের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল খৃষ্টপূর্ব যুগেব বাঙালির বাণিজ্যিক ইতিহাস। একদা বাঙালির বাণিজ্যবহর নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যেত মিশরে, ক্রিটে, বেবুনে এবং সুদূর গ্রীসে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্রেষ্ঠ বণিক জাতি বাঙালি, একথা আজ বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। অথচ তাই ছিল। বাঙালির এই বাণিজ্যিক ইতিহাস আবিষ্কার করতে দরকার হয়েছিল কয়েকটি কাক। হ্যাঁ, কাক। আবিষ্কার করেছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। আর তাকেই পুঁথিপত্র ঘেঁটে প্রমাণ করেছেন প্রত্নতত্ত্বের প্রখ্যাত লেখক।' লেখক গ্রন্থটিতে কাকের কাহিনী নির্মাণে সাহায্য নিয়েছেন ঈশান ঘোষের 'জাতক কাহিনী,' নীহাররঞ্জন রায়ের

'বাঙালীর ইতিহাস', পি.সি. দাশগুপ্তর The Excavations of Pandu Rajar Dhibi, সুভাষ সমাজদারের 'বাণিজ্যে বাঙালী—একাল ও সেকাল', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ঐতিহাসিক নিবন্ধ'।

কাহিনী সূত্রে জানা যায় কাকেদের পায়ে আংটি পরিয়ে দেওয়া হত। তিন-চার হাজার বছর আগে, সামুদ্রিক প্রতিকূলতাতেও বাণিজ্য চলত। বাঙালিরা বেরিয়ে পড়ত। লেখক লিখছেন:

'এদিকে দেশের বণিকরা অপেক্ষা করে আছে বহর ফেরার। বহর ফিরবে তো আসবে নানারকম বিদেশি পণ্য। বিদেশে বেচে এক রকম লাভ। আবার বিদেশি পণ্য দেশে এনে আর এক কিস্তি লাভ।

অথচ নিশ্চয়তা ছিল না বহর ফেরার। সমুদ্র কেড়ে নিত বহর। ডুবিয়ে দিত অতল অন্ধকারে।

তাই নানা দুর্ভাবনা থাকতো বেনিয়াদের। বহরের খবর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। তাদের মানসিক উত্তেজনা থেকে রেহাই দেবার উপায় কি?

কাক, কাক সেই দায়িত্ব পালন করতো। দেশের কাছাকাছি এসে কাকগুলো উড়িয়ে দিত তারা। দীর্ঘ বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে তীর বেগে কাকগুলো উঠে যেত আকাশে। তারপর পাড়ি জমাতো নিজ নিজ আস্তানার দিকে।'

কাকেদের পায়ে আংটি দেখেই বোঝা যেত পণ্যের নাম পরিচয়। তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছবে সপ্তডিঙা।

দিশাকাকের তাৎপর্য এখানেই। অর্থবহতাও। পটলমামা 'কথা বলতে বলতে পকেটে হাত গলিয়ে দিলেন। টেনে বের করে আনলেন আংটির মালা। আঙুলের মাথায় ধরে পাক খাওয়াতে থাকলেন। আপন মনে বললেন আশ্চর্য। প্রতিটি কাক ফিরে এসেছে। এমন নির্ভুল বার্তাবহ একটা পাখির কথা ভুলে গেল বাঙালি।'

গল্পের মোড়কে, তথ্যভিত্তিতে, বাঙালির গৌরবময় অতীতের সঙ্গে কাকের, দিশাকাকের সম্পর্ক ও ভূমিকা এখানে উপস্থাপিত। তবে বাঙলা কথাসাহিত্য, কাব্যে যে কাক বিস্মৃত নয়, উপেক্ষিত নয়, তা বোধ হয় জোর দিয়েই বলা যায়।

বাঙলা কবিতায় অত্যন্ত আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের 'কাক'-এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শুধু নিছক উল্লেখের জন্য নয়, জীবনের সঙ্গে,

বোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই তার গুরুত্ব [এ-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এই সংকলনে রয়েছে, সেটি দ্রষ্টব্য]।

স্মৃতিবিধুরতায় নিবিষ্ট কবির কাছে দাঁড়কাক নষ্টালজিয়ার সূত্র হয়ে উপস্থিত হয়েছে। নানা কবিতায় কবি বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যার কাকের উড়ে যাওয়া, নীড় খোঁজা, অশ্বত্থের নীড়ে দাঁড়কাকের অবিরাম পাখনার শব্দ, পথহারা দাঁড়কাকের ঘরের সন্ধান পাওয়া। জীবনানন্দ অজস্র কবিতায় কাককে নিয়ে এসেছেন তাঁর ভাবনা-সূত্রে, পরিবেশরচনা ও প্রকৃতির রূপাঙ্কন সূত্রে। এই গ্রন্থের অন্য এক আলোচনায় তার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে [পৃ. ৯৫]।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে সব সুর কেটে দিতে পারে এক কাক ডাকা গহন দুপুর। তিনি লিখছেন 'কাক ডাকে' কবিতায় :

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর
আকাশে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া
অসীম শূন্যতা
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠে কাক।
গান নয়, সুর নয়
প্রেম হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়
সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

এই কবিতারই অন্য অংশে :

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর
সে শব্দের ধু ধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

বলার কথা এটাই যে জীবনানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমানসের ভিন্নতা ও জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য কাককে কেন্দ্র করেও বোঝা যেতে পারে।

আমারা সূচনায় উল্লেখ করেছিলাম পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাকেরা আশ্চর্য পাখি' কবিতাটির কথা। তাঁর 'কাক' কবিতাটিও অন্য মাত্রা পায় যখন তিনি বলেন :

কাকের গোচরে আছে সব সমাচার
এমনকি কাকেদের জমায়েত সমাবেশও আছে
প্রচুর প্রস্তুতি আছে, আছে হাঁকডাক
শুধু পার্লামেন্ট নেই, নেই সংবিধান
কমিশনটমিশন নিয়ে মাথা ঘামাবার মত
যথেষ্ট সময় নেই কাকেদের কঠিন সংসারে।

কাকেরা তো সকলে মজুর — ব্যস্ত খুব পরিশ্রমী
এমন সময় যদি একটি বয়স্ক রোগা কাক
এ্যান্টেনায় ঝিম মেরে রোদ মেখে গায়
আমাদের শহরে বুদ্ধিজীবীদের মত একাকী, কর্তব্যহীন
মনে হয় তাকে ; নাকি শুধু হেমন্তের হাওয়া লেগে
সাময়িক কিছুটা উদাস — অথবা এসব নয়
এ্যান্টেনায় বসে আছে পক্ষীসমাজের এক ধাতু বিশারদ।

এবং কবির অনবদ্য অনুভূতি — 'কাক ছাড়া কলকাতা — ভাবা যায় সে কেমন নিঝুম শহর।'

অন্নদাশঙ্করের নির্দোষ ছড়ায় 'কাকের ডাক' নিয়ে তাঁর নির্মল অভিব্যক্তি আমাদের প্রীত করে :-

কাক রে
গলা ছেড়ে ডাক রে।
ডাক শুনে তোর ঘুম ভেঙে যাক
রাত্তির পোহাক রে।

কাক রে
জোরে জোরে ডাকরে।

ডাক চলে যাক আকাশ পানে
দরোজা হোক ফাঁক রে।

দেখা দেবেন সুয্যিঠাকুর
বাজবে ভোরের শাঁখরে।

কিংবা
'ভূষণ্ডী কয়
শোনরে উল্লুক...
এতদিন ছিল ঠগের মুল্লুক
এইবার হবে মগের মুল্লুক।'

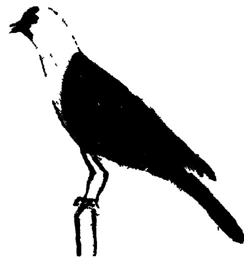
অজস্র কবিতায় কাকের প্রসঙ্গ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে কয়েকটি নমুনা রইল। শুধু বলার কথা, বাঙলা কথাসাহিত্যে, কবিতায় আশ্চর্য পাখি কাক যে নিয়ত-নিন্দিত তাকে নিয়ে চর্চা লোকজীবনের আত্মচর্চাও বটে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার জলবাতাসে কাক গবেষণা ও আলোচনার, কবিতা ও কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারছে সংস্কৃতি চর্চায় এর মূল্য কিছুমাত্র কম নয়।



পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : কাকমারা

প্রবোধকুমার ভৌমিক



পূর্বকথা :

সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ ছিল যাযাবর। কেননা তাদের সেদিনের জীবন-যাপনের উপযোগী উপাদানসমূহ ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এ-ছাড়াও প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার মতো প্রকৌশল বা ব্যবহারিক জ্ঞানও ছিল অনেকটাই অপরিপূর্ণ। তাই খাদ্যান্বেষণের চেষ্টায় [ফলমূল আহরণ বা শিকার সন্ধান] আদি মানুষকে অনিশ্চয়তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। যখনই কোন এক স্থানের খাদ্য-উপকরণ শেষ হয়ে আসতো, তখনই ছুটতে হত অন্য কোন এক সচ্ছল উপকরণের জায়গায়। এই যাযাবরবৃত্তি মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটি ধাপ, যা প্রত্নপ্রস্তরযুগের সভ্যতা নামে পরিচিত। এই অবস্থায় তাদের নিয়ত পরিবেশ-পরিমণ্ডলের সঙ্গে অভিযোজন করে চলতে হত; নিয়ত যুদ্ধ করতে হত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে — আদিম হিংস্র জন্তুর সঙ্গেও, — ফল, জীবনে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা।

এই অনিশ্চিত যাযাবর জীবন থেকে মানুষের মুক্তি হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব কম-বেশি ৫০০০ বছর আগে — যখন সে কৃষিকাজের সূচনা করেছে। চাষ করতে হয় এক জায়গায় থেকে — আর এই কৃষির প্রয়োজনেই তাকে স্থায়ী ঘর বাঁধতে হয়। মানব-জীবন-যাত্রার এই পটপরিবর্তনের ঘটনা ঐতিহাসিক। কিন্তু এর মাঝেও অনেক জিজ্ঞাসা থেকে গেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, স্থান-কাল পরিবেশের সঙ্গে, অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে তাদের যে সাংস্কৃতিকজীবন আকৃতি লাভ করে, তাই-ই ধীরে ধীরে পরম্পরার পথ বেয়ে সমাজদেহে আশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকে, যতক্ষণ না বাইরের কোন চাপ তাদের মন ও মানসিকতাকে দলে মুচড়ে বিকৃত বা পরিবর্তিত না করে দিয়েছে। কখনো বা ঐ সাংস্কৃতিক জীবন বৃহত্তর সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রাখতে ব্যর্থও হয়েছে। তখন কোন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই নতুন সাংস্কৃতিকবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে; — ফলে তাদের সাংস্কৃতিক অবয়বে পরিবর্তন ঘটে গেছে। আবার

এও দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বির্পযয়ে ঘরবাঁধা মানুষ শুধু নিঃস্ব হয়েই যায়নি, জীবন ও জীবিকার ঐকান্তিক তাগিদে আলোছায়ার মতো ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। অথবা বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক বলয়েব আশে-পাশে, বাঁচার উপদান লাভের আকাঙক্ষায় বিচরণ করেছে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে, যে আজ প্রত্যক্ষত যে যাযাবর, সে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল জীবন-স্রোতের সঙ্গে হয়তো যুক্ত ছিলো, অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ে [secondary stage] অস্বাভাবিক কোন রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

উক্ত বক্তব্যেব তাৎপর্য হল যে কোন মানবগোষ্ঠী আদিমতার অনুষঙ্গ বা নিঃসঙ্গতাব মধ্যে দিয়ে যাযাবরের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, আবার কখনও বা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাযাবরত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা 'বিরহড়' ভূমিপুত্রদেব কথা ভাবতে পারি, অথবা 'লোধা'দের কথা। এঁরা আজও স্থায়ী ঘর বেঁধে ভূমিলগ্ন কৃষি-জীবনের মানসিকতায় নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারেনি। আবার এমনও দেখা গেছে, যে অবস্থার বিপাকে কোন কোন গোষ্ঠী যাযাবরেব জীবনকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে; তখন স্থায়ী জীবনযাপনের জন্য ঘর-বাঁধা তাদেব মানসিকতায় স্বপ্ন মাখানো কুহেলিকা বলে মনে হয়; —কাকমারারা এই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে।

কাকমারাদের কথা : সূচনা :

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সমতলে এই কাকমারা সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায়, যারা সারা বছর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এই জেলায় এদের সংখ্যা কমবেশি ২৫০—৩০০-র মতো। এই কাকমারাদেব আচার-আচবণে যে-সব বৈচিত্র্য লক্ষ্য কবা যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হল : এরা শ্মশানের ফেলে-দেওয়া হাঁড়ি-কলসি কুড়িয়ে নিজেদের রান্নার কাজে ব্যবহার করে, মড়াপোড়ানো অর্ধদগ্ধ কাঠও দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করে। এবং এদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানও নেই। অবশ্য একটা স্থায়ী আস্তানা রাখার চেষ্টা যে করে না তা নয়; তবে ঐ আস্তানায় থাকে অক্ষম ব্যক্তিরা, যারা ঘোরা-ফেরা করতে পারে না, —যেখানে তারা হয়তো বছরে একদিন ফিরে আসে। এই ক্রমচলিষ্ণুতা তাদের এক যাযাবরগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। বর্তমান নিবন্ধে আজও যাযাবরবৃত্তিতে অভ্যস্ত ঐ কাকমারা সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ এবং ব্যবহারিক

রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করা হবে। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে তথ্য অনুসন্ধান করে *Man in India* [Vol. 39. No. 4] নামক বিখ্যাত 'জার্নালে' ১৯৫৯ সালে একটি প্রতিবেদন রচনা করেছিলাম। সেটিকে কিছু পরিমার্জিত করে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত আমার গবেষণা গ্রন্থ *Socio-Cultural Profile of Frontier Bengal*-এ প্রকাশ করি। উক্ত দুই লেখা পরিমার্জিত হয়ে এখানে প্রকাশিত হল। দীর্ঘদিনের ব্যবধানের ফলে পরিসংখ্যানগত কিছু অদল-বদল হলেও আমার মৌল নিরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত এবং কাকমারাদের জীবনযাত্রা আজও প্রায় অপরিবর্তিত আছে।

কাকমারারা নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গা তেলেগুতে কথা বলে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে 'মাদ্রাজী' হিসাবে এরা নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়েছে। বাইরের লোকের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় কথাবার্তা বলে থাকে। যাযাবর হওয়ার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সমাজ-বন্ধন বেশ শিথিল। সাধারণত বাজারের কাছে বা কোনো মেলার ধারে বা বড় গাছের নিচে অথবা অন্য কোনো সুবিধা-মতো জায়গায় এরা নিজেদের আস্তানা গড়ে। কেমন রোজগার হচ্ছে তাই দেখে, একনাগাড়ে ১০ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত কোনো জায়গায় এরা ডেরা বাঁধে। ভিক্ষাই এদের উপার্জনের প্রধান উৎস। তবে সবটাই নির্ভর করে স্থানীয় অর্থনীতির ওপর, কারণ, কৃষিনির্ভর গ্রাম যদি সমৃদ্ধশালী হয় তবে তাদের ভিক্ষাও সেখানে ভালোভাবেই জোটে, আর তারাও সেখানে বেশিদিন থাকতে উৎসাহিত হয়। অনেক সময় পরিত্যক্ত দোকান ঘর বা ছুটি থাকা স্কুল বাড়ির খালি ঘর দু-এক রাতের তাৎক্ষণিক আবাস হিসাবে ব্যবহার করে। গাছতলায় থাকার সময় গাছের উচু ডালে কাকমারারা তাদের বিছানা-পত্র রাখে। তা-ছাড়া অন্যান্য তৈজসপত্রাদিও ঝুলিয়ে রেখে দেয়। যদিও এরা যাযাবার, তবুও এই জেলার কোনো কোনো অংশে এদের আধাস্থায়ী আস্তানা দেখা যায়; ঐ সমস্ততে বৃদ্ধ-অশক্ত এবং অসুস্থ লোকেরা আশ্রয় নেয়; —তারপর যেই একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে অমনি সেগুলি ভেঙে দিয়ে আবার যাযাবরের মত দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে যে কাঁথি, তমলুক এবং সদর-মহকুমার নানা জায়গায় এই যাযাবরদের প্রধান বিচরণভূমি। প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যার বালেশ্বর ও পুরী জেলাতেও এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই কাকমারারা আজ প্রায় দু-শ বছর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নিজেদের মৌল

বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই হারিয়ে বসে আছে। মেদিনীপুর জেলায় এদের অবস্থানের জায়গা এবং জনসংখ্যার ছকটি এই রকম :

সারণী : ১

মহকুমা	থানা	আস্তানা বা গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের নাম
কাঁথি	কাঁথি	পিসকাচক	১
		ডিঙ্গলবেড়িয়া	২
		মশাগাঁ	২
		কৃষ্ণনগর	৮
		ভবানীপুর	২
		শিলিবাড়ি	৪
		নমলডিহা	১
		অন্নপূর্ণা	১
	পটাশপুর	প্রতাপদিঘি	৩
		লওয়া	১
		মঙ্গলামারো	১
	খেঁজুরি	আলিপুর	১
		গোলাবাড়ি	৬
		মুণ্ডামারি	১
		আজনবাড়ি	১
তমলুক	নন্দীগ্রাম	শ্রীধরের বাজার	১
		হংসচরা	১
		হরিখালি	১
	মহিষাদল	চক বৈষ্ণবেড়িয়া	২
		রনের বাজার	১
	সূতাহাটা	বাজিতপুর	৩
সদর	সবং	মকরামারিচক	৫
		বনিয়া	১

কাকমারাদের সম্ভাব্য উৎস ও যাযাবর বৃত্তির কারণ :

এই আদিবাসীদের উদ্ভব ও যাযাবরবৃত্তির প্রকৃত কাবণ নির্ধাবণ কবা অসম্ভব। এরা কেউ কেউ নিজেদের অহির [?] বলে এবং বহুদিন আগে নিজ দেশ ছেড়ে এদেশে এসেছে। তারা নিজেদের দেশে গরু-ছাগল-শুওব চবাতো এবং কারো কাবো ঐসব পোষবাব খোঁয়াড়ও ছিল। একে তো চিবস্থায়ী দারিদ্র্য এবং বারে বারে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণে তারা যাযাবব বৃত্তি গ্রহণ কবতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান জায়গাটাকে তারা বেশ বাসযোগ্য মনে কবে; কারণ প্রয়োজন মতো খাদ্য-সামগ্রী এখানে জুটে যায় এবং বাকিটুকু তারা ভিক্ষা কবেই জোগাড কবে নেয। কৃষিকর্ম এদেব কৌলিক পেশা নয়, এমনকি. এই মেদিনীপুব জেলার কোথাও এদেব কৃষিশ্রমিক হিসাবেও কাজ কবতে দেখা যায় না। সে-যাই হোক, এই জেলায় দীর্ঘদিন বসবাস কবতে কবতে. মূল বাসভূমির সঙ্গে তাদের যোগযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও, এবা নিজেদেব মধ্যে ভাঙা তেলেগু ভাষায় কথা বলে এবং এদেব বিশ্বাস যে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের ফলে তাদেব মাতৃভাষা আর তারা বুঝতেও পারে না।

জনসংখ্যা ও বাসস্থান :

প্রত্যেক বছব লোকালয়েব বাইরে যে জায়গাগুলিতে কাকমারাব কিছুদিন ধরে বসবাস করে, সেগুলিই এদের অস্থায়ী অথচ নির্দিষ্ট বাসস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধকার সরেজমিনে অনুসন্ধানের জন্য এই রকম চাবটি আস্তানাকে বেছে নিযেছিল।

কৃষ্ণনগর গ্রামটি কাঁথি শহরের কাছেই অবস্থিত। ১৯৪২ সালেব বিধ্বংসী ঝড়েব পর আটটি কাকমাবা পরিবার এখানে অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল। স্থানীয় জমিদার এদের কিছু নিষ্কর জমি দিয়ে এদেব এখানে বসবাস কবাব জন্য বিধিমত অনুমতি দিয়েছিলেন। ওদের আস্তানাটি ছিল গ্রামের এক কোণে বালিয়াডির ধারে। বর্তমান লেখক যখন ক্ষেত্রগবেষণার জন্য ঐ এলাকায় যান তখন ঐ আটটি পরিবারের মধ্যে পাঁচটি পরিবারই তাদের দৈনন্দিন জীবিকানুসন্ধানের কাজে বেবিয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন মাটির দেওয়াল দিয়ে তালপাতার ছাউনিওয়ালা একটা কুঁড়ে বানিয়ে নিয়েছে।

গ্রামের বাইরে, একটি বড় পুকুরের ধারে ডিঙ্গলবেড়িয়াব কাকমারা বস্তি। ঐ পুকুরেরই অন্যপাড়ে এক মাহিষ্য-পরিবার সম্প্রতি একটি ধানভানা-কল বসিয়েছে। এ-ছাড়া বর্তমান লেখক অনুসন্ধান কালে লক্ষ্য করেছিলেন যে

একজন বৃদ্ধা ছাড়া ঐ কাকমারা বস্তির সকলেই দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রয়েছে। ঐ বুড়িমা ভিক্ষা করে কোন রকমে দিনপাত করছে।

স্থানীয় এক জমিদারের মালিকানাধীন একটি বড় পুকুরের ধারে রয়েছে গোলাবাড়ি বস্তিটা। এখানে সবসুদ্ধ দুটি পবিবারের বাস। ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় পরিবার দুটির সবাই ডেরায় অনুপস্থিত ছিল। গোবিন্দ নামে একজন একটা মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনি দিয়ে একটি কুঁড়ে তৈরি করেছে, এর জন্য এরা কাউকে কোন খাজনা বা ট্যাক্স দেয় না।

একটি পবিত্যক্ত পুকুরেব পাড়ে রয়েছে বাজিতপুরের বস্তিটি। বিগত ঝড়েব পব নন্দীগ্রামের বাজারের কাছ থেকে সরে এসে পঞ্চানন নামে এক কাকমারা, পুকুরের পাড়ে একটা ছোট পাতার কুঁড়ে তৈবি করে নিয়েছে। সম্প্রতি ঐ পুকুরের কাছে পিচের বাস্তার ধারে, স্থানীয় এক সাধুবাবা কর্তৃক মেয়েদের একটি জুনিয়র হাইস্কুল তৈরি হয়েছে। দু-একটা দোকানও আশে-পাশে গজিয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানের সময় দুটি কাকমারা পরিবারকে ভিক্ষায় বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে; —যাবার সময় পঞ্চানন দুটি বাচ্ছাসহ তার বুড়িমাকে ঐ জীর্ণ কুঁড়েতে রেখে গেছে। বাচ্ছা দুটি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে।

ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে এদের জনসংখ্যার নানা পরিবর্তন দেখা গেছে সত্য, তবুও যতদূব খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে যে যারা উক্ত গ্রামগুলিতে বাস করে তাদের জনসংখ্যা এই রকম:

সারণী : ২

[জনসামর্থ্য]

গ্রাম / আস্তানা	পরিবার সংখ্যা	জনসামর্থ্য : মোট	পুরুষ	নারী
১. কৃষ্ণনগর	৮	২৮	১৪	১৪
২. ডিঙ্গলবেড়িয়া	২	৮	৩	৫
৩. গোলাবাড়ি	৬	২৬	১৫	১১
৪. বাজিতপুর	৩	১৩	৬	৭
মোট :	১৯	৭৫	৩৮	৩৭

বৃত্তি এবং আস্তানা :

কাকমারাদের প্রধান জীবিকা হল ভিক্ষা। এদের বাৎসরিক পরিভ্রমণের সময় এলে দু-একটি পরিবার একত্রে ঘুরে বেড়ায়। খুব ভোরে পান্তাভাত খেয়ে কাছাকাছি গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে যায়। যে পরিবারেব যেমন লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে তারা দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। এদের পুরুষদের পোশাক বড় বিচিত্র। ভিক্ষায় বেরোনোর আগে মাথায় একটা পাগড়ী বা রঙিন ফেট্টি বেঁধে নেয়—কপাল পরে সিঁদুরের টিপ, ডান হাতে লোহার বালা এবং আত্মরক্ষার জন্য হাতল-বিহীন একটা ধারালো ছুরি সঙ্গে রাখে। এ-ছাড়াও সঙ্গে থাকে তালপাতার তৈরি একটি ঝোলা, একটা চেটাই, আব পাখি মারবার বা ধরবার জন্য খুব ছোট ও সূচিমুখ বর্শা। সঙ্গের পোষা কুকুরগুলি গাছের ডালে ঝোলানো এদের বিছানাপত্তর ও তৈজসাদি পাহারা দেয়। মেয়েরা সবসময়েই তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই বাইরে বেরোয়। খুব শিশুদের কাপড় দিয়ে পিঠে বেঁধে নেয়। বেশি বেশি ভিক্ষা পাবার জন্য এরা চড়া সুরে 'গোবিন্দ' / ভগবানের নাম কীর্তন করে এবং সাধারণত প্রত্যেক বারেই ভিক্ষা পাবে এমন লোকের কাছেই আবেদন করে। ক্রমাগত থুতু ফেলা এদের একটি নোঙরা অভ্যাস এবং যেখানেই যায় সেখানটাই এইভাবে নোঙরা করে ফেলে। এরা মাঝে মাঝে শরীরের নানা জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে রক্তপাত ঘটায় এবং গ্রামবাসীদের সহানুভূতি আদায় করে প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা, পুরানো কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

কাকমারারা ছাগল, কুকুর এবং বেড়ালের নির্বীজীকরণের কাজ করে থাকে। কেউ যদি এর জন্য তাদের সাহায্য চায় তবে তারা কিছু অর্থের বিনিময়ে সেই কাজ করে দেয়।

স্থানান্তরে যাতায়াত করলেও এরা শুওর পোষে। একবার কাঁথিব এক জমিদার কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এদেরকে কিছু শুওর পালতে দিয়েছিল। যেখানে কাকমারারা বসবাস করে সেখানকার জনসাধারণ বর্তমানে শুওর পালা বা তার চাষ করাতে প্রবল আপত্তি তোলায় এরা শুওর পালা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে; তবুও কিছু কিছু কাকমারা পরিবারের শুওর আছে।

বাজিতপুরের হরিচরণ একজন কাকমারা। বর্তমানে সে রিক্সা চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করে। এরা তাদের ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রায় সমস্ত বাজারগুলোকেই

একের পর এক অতিক্রম করে যায়। গত এক বছর নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে গোলাবাড়ির শ্রীনিবাস দাস কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে তার একটি তালিকা সে আমাকে দিয়েছে। তালিকাটি এই রকম:

সারণী : ৩

[শ্রীনিবাস দাসের ডেরা বাঁধার তালিকা (১৯৫৮—৫৯)]

মাস [আনুঃ]	থাকার দিন [আনুঃ]	স্থান
জুলাই	২০	জুখিয়া বাজার
জুলাই-আগস্ট	১৫	ইবিঞ্চি
আগস্ট-সেপ্টেম্বর	৩০	বীরভাণ্ডার বাজার
সেপ্টেম্বর	২৫	কৃষ্ণমোহন জানার বাজার
অক্টোবর	১৫	মুণ্ডামারি [একটি গাছের নিচে] কিছুদিন একটা দোকানে
অক্টোবর	১৫	দুনপাড়া বাজার
নভেম্বর	১৫	তেখালি বাজার
নভেম্বর	১৫	টাকাপুরা বাজার
ডিসেম্বর	১৫	কামারদা বাজার
ডিসেম্বর	১৫	তিকাশী বাজার
জানুয়ারী	১৫	মুগবেড়িয়া বোর্ডিং বাজার
জানুয়ারী	১৫	বৈন্নদা বাজার
ফেব্রুয়ারী	১০	গোপীনাথপুর
ফেব্রুয়ারী	১৮	ঈশ্বরপুর বাজার
মার্চ	১৫	শ্রীকৃষ্ণপুর [রাস্তার ধারে গাছের নিচে ও স্কুল বাড়িতে]
মার্চ	১৫	নাজির বাজার
এপ্রিল	২০	ঘোলপুকুর বাজার
এপ্রিল-মে	২০	গোলাবাড়ি বাজার [নিজের অস্থায়ী বাসস্থানের কাছে]

বৃদ্ধা মাকে দেখাশুনার জন্য এবং পৌঁছে দেবার কারণে শ্রীনিবাস দাস এই দীর্ঘ সময় নিজের অস্থায়ী আস্তানায় মাসে একবার করে এসে ঘুরে গেছে।

বস্তুগত সংস্কৃতি :

এদের কুঁড়েগুলো হল আয়তক্ষেত্রাকৃতি। গাছের ডাল পুঁতে তাতে গোবর-কাদা লেপে এরা ঘরের দেওয়াল বানায়, কাছাকাছি গ্রাম থেকে খড় চেয়ে এনে মাথার ছাউনি দেয়। ঐ কুঁড়েগুলির দরজা খুবই নিচু—হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এবং কোনো আগড় নেই। এমন সংবাদ পাওয়া গেছে যে ঐ সব কুঁড়ে তৈরি করতে পারস্পরিক কোনো সাহায্য না পেলেও প্রতি পরিবারের সবাই মিলে নিজেদের কুঁড়ে বানিয়ে নেয়। কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ধাঁচ ঐসব কুঁড়ে তৈরিতে আদৌ ব্যবহৃত হয় না। এদের ঘরের তৈজসপত্রাদি খুবই অকিঞ্চিৎকর। একটা বা দুটো লোহার বা জার্মান সিলভারের বা মাটির বাসন-কোসন বা রাঁধবার হাঁড়ি-কুঁড়িই এদের সম্বল। খেঁজুর পাতার চেটাই এদের বিছানা। গোলাবাড়ির গোবিন্দ শ্মশান থেকে একটা পরিত্যক্ত চারপাই এবং বাজিতপুরের পঞ্চানন কোথা থেকে একটি বেঞ্চি কুড়িয়ে এনেছিল।

পোশাক এবং গহনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরা একেবারে হত-দরিদ্র। সস্তাদরে পুঁতির মালা ও চুড়ি এরা ব্যবহার করে। মেয়েরা কপালে এবং ওপর হাতে উল্কি ব্যবহার করে থাকে। পঞ্চাননের কিছু সোনা ও রূপার গহনা আছে। এ-ছাড়াও তার তিন বিঘা চাষের নিজস্ব জমি আছে। ভাত এদের প্রধান খাদ্য, বাজার বা স্থানীয় জনপদ থেকে ভিক্ষা করা তরিতরকারি এবং সব ধরনের মাছই এরা খেয়ে থাকে। এরা বেঁজি, ভোঁদোড়, ধেড়ে ইঁদুর, কাক শিকার করে তাদের মাংস খায়। প্রত্যেক পরিবারেরই একাধিক কুকুর আছে, এগুলি তাদের শিকারের কাজের সহায়ক। খুব ছোট বর্শাকে ক্ষেপণাস্ত্রের মত ব্যবহার করে পাখিদের এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিঁধে ফেলে। বিচিত্র কায়দায় তৈরি এক ধরনের জাল এরা কাক ধরার জন্য ব্যবহার করে। প্রথমে জালটাকে মাটিতে বিছিয়ে তাতে গোঁজ আটকে দেয়। এর এক প্রান্ত একটা বড় বাঁশের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা থাকে এবং অপর প্রান্তে একটা লম্বা-দড়ি বেঁধে শিকারি কাকমারা দূরে বসে অপেক্ষা করে। ভিজে চাল টোপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও মরা কাকের পালক এমন কায়দা করে সাজানো হয় যে ওগুলোকে অন্য কাক বলে মনে হয়। এইভাবে কাকেরা প্রলুব্ধ হয়ে যেই জালের নিচে আসে, অমনি শিকারি দড়ি ধরে টান দেয় আর জালের নিচের মাটি থেকে খাবার খুঁটে খাওয়া কাকদের ওপর আপনা-আপনি চাপা পড়ে যায়। এরা বলে যে, তিন থেকে পাঁচজন লোক এক সঙ্গে কাজ করে

এক এক খ্যেপে ত্রিশ/পঞ্চাশটা কাক ধরতে পারে।

মাছ্ ধরার জন্য এদের খুব কমই যন্ত্রপাতি আছে; কেবল বাজিতপুরের পঞ্চাননের একটি মাত্র ছিপ বঁড়শি আছে।

এরা মদ্যপানে বিশেষভাবে আসক্ত। এই অঞ্চল প্রচুর পবিমাণে যে খেঁজুরের রস পাওয়া যায় তাকে গেঁজিয়ে নিয়ে এরা মদ তৈরি করে। সারাদিন ভিক্ষা করে ফিরে এসে রাত্রে মেয়ে-পুরুষে এরা মদ্যপান করে। পান দোক্তা এদের অতি প্রিয় নেশা।

সামাজিক অবস্থান :

কাকমারারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং কখনও গো-মাংস খায় না। এদের কেউ কেউ নিজেদের অহির বা গোয়ালা [?] বলে অভিহিত করে। নিজেদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি ও আদি পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কোন সন্ধানই এরা আর রাখে না। অপরিচ্ছন্ন এবং পরিত্যক্ত জিনিসপত্র এরা যে-ভাবে ব্যবহার করে তার জন্য এরা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে অচ্ছুৎদের মধ্যেও একেবারে নিচের তলার মানুষ হিসাবে গৃহীত হয়। অবশ্য কেউই কখনও এদের আইনগ্রাহ্য অপরাধ করতে দেখেনি। প্রাথমিকভাবে উক্ত চারটি কাকমারা বস্তির ওপর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে, পাঁচজন স্থানীয় মানুষ নিজেদের কাকমারা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। ঐ পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে জানা গেছে, তারা অতি সহজেই কাকমারাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। আরো শোনা গেছে যে, নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণেই তাদের অভিভাবকেরা তাদের কাকমারাদের হাতে সঁপে দিয়েছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠার ৪নং সারণী থেকে ঐ পাঁচজনের পূর্ণাঙ্গ জাতি-পরিচয় জানা যাবে।

এই লোকগুলি আজও তাদের পূর্বতন পবিচয় মনে রেখেছে, তবুও পরিজনেবা তাদের যেমন ফিরে গ্রহণ করতে চায় না, তেমনি আত্মীয়েরাও তাদের নিজ নিজ জাতি-পরিচয়ে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ দেখায় না।

স্থানীয় কোনো অনুষ্ঠানে যদি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা হয়, তবে কাকমারারাও সেখানে এসে জোটে। এবং খাওয়ার পর অন্যান্য অচ্ছুৎদের মতো তাদেরও এঁটো পাতা তুলতে ও খাওয়ার জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে হয়।

সারণী : ৪

[কাকমারাদের মধ্যে অন্য জাতের মানুষ]

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	স্ত্রী-পুরুষ	বয়স	মূলজাতি পরিচয়	জন্মস্থান
১.	সুভদ্রা	স্ত্রী	১৮	তাঁতি/বৈষ্ণব	কলামদান
২.	যামিনী	স্ত্রী	২১	মাহিষ্য	ঐ
৩.	বাসন্তী	স্ত্রী	৬২	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	রাণীচক
৪.	মতিলাল	পুরুষ	৪৫	মাহিষ্য	হরিখলি
৫.	মোক্ষদা	পুরুষ	৩৫	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	সূতাহাটা

সামাজিক গঠন :

কাকমারাদের সমাজ দুটি ভ্রাতৃয়দলে [Phratry] বিভক্ত। নিজেদের ধর্মগুরু হিসাবে মান্য করে এমন দুজন ব্যক্তির নামে ঐ ভাগটি হয়েছে। ঐ দুই গুরুব নাম হলো : রাম সিং এবং নারায়ণ দাস। এই কারণে বাম সিং-গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নামের শেষে 'সিং' এবং নারায়ণ-এর দলের লোকেরা 'দাস' বা 'সরদার' পদবী গ্রহণ করে থাকে। সমস্ত কাকমারা পরিবারই এই দুই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের বক্তব্য হচ্ছে যে এরা আদিতে সবাই রাম সিং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অনেককাল আগে ঘটনাচক্রে কেউ একজন অজানিতভাবে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়ে করে ফেলে। তখন সামাজিক নীতি অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে তার গুরু পরিবর্তন করতে হয় এবং তখন থেকেই একদল রাম সিং-এর দলে এবং বাকিরা নারায়ণ দাসের দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

এ-সব তথ্য বাজিতপুরের পঞ্চাননের বৃদ্ধা মা বাসন্তীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেছে। প্রসঙ্গত একথা স্বীকার্য যে অনেক চেষ্টা করেও ঐ তথ্যের পূর্ণাঙ্গ সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

কাকমারাদের পরিবার গঠনে তিনটি ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় : ক্ষুদ্র [simple] পরিবর্ধিত [extended] এবং যৌথ [joint]। যেখানে বিধবা মা বা বাবা তাঁর বিবাহিত পুত্রের সঙ্গে বসবাস করে সেটি হলো বর্ধিত গোষ্ঠী। যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র তার অভিভাবকদের সঙ্গে একত্রে থাকে। নিচের সারণীটিতে পরিবার গঠনের পরিসংখ্যান দেওয়া গেল :

সারণী : ৫

ক্ষুদ্র পরিবার	পরিবর্ধিত পরিবার	যৌথ পরিবার	মোট
১৪	৪	১	১৯

ঐ চৌদ্দটি ক্ষুদ্র পরিবার দুই বয়স্ক বিধবা মহিলাসহ কৃষ্ণনগরে বাস করে। ঐখানে চার ব্যক্তির বৃদ্ধা মা বেঁচে আছে এবং একজনের দুই বিবাহিত পুত্র সস্ত্রীক তার সঙ্গে বসবাস করে।

বিবাহ ব্যবস্থা :

কাকমারাদের মধ্যে সাধারণত এক-বিবাহের প্রচলন রয়েছে। বিধবা-বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে দ্বি-মুখী অসবর্ণ বিবাহসম্পর্কিত গোষ্ঠী বর্তমান, তাই ঐ দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই এরা বিবাহকার্য নিষ্পন্ন করে থাকে। যে-রকম সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে এদের মধ্যে আন্তর-আত্মীয় বিবাহেব প্রচলন [মা বা বাবা উভয়েব দিক দিয়ে] রয়েছে। অর্থাৎ পিসতুতো বোনের বা মামাতো ভায়ের মেয়ে বা ছেলের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। গোলাবাড়ির শ্রীনিবাসের বংশতালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, সে তার বাবার বোনের মেয়ে অর্থাৎ পিসতুতো বোন শৈলবালাকে বিয়ে করেছে। পঞ্চাননের মা বাসন্তীর বক্তব্যানুসারে জানা যাচ্ছে যে, কাকমারারা তাদের বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগ্নীকেও বিয়ে করে থাকে। তার [বাসন্তীর] ছেলে পঞ্চানন নিজের পিসতুতো বোনের মেয়ে [সম্পর্কে ভাগ্নী] বিলাসীকে বিয়ে করেছে। এ-বিষয়ে আরো অনুসন্ধান চালালে আরো নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

পণ নিয়ে কাকমারাদেব মধ্যে বিয়ের প্রচলন থাকলেও কন্যাপণ দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। অনুসন্ধানের সময় এমন একটিও উদাহরণ পাইনি যেখানে দেবর-ভাসুর-বরণ বা শ্যালিকা-বরণ প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য এদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিধবা-বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছিন্নকারীদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেখানে স্ত্রী অলস বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ব' দম্পতির মধ্যে যে কোন এক পক্ষ দাম্পত্য পবিত্রতা নষ্ট করে সেখানেই মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ গৃহীত হয়। যেমন, ডিঙ্গলবেড়িয়ার বিবাহিতা রমাদাসীর অন্য এক বস্তীর ভিনপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো; ফলে, তার স্বামী তার অভিভাবকের

কাছে কন্যাপণের টাকা ফেরৎ চায়। তখন ঐ বস্তির 'পঞ্চজন' নির্দেশ দেয় যে, রমাদাসী তার হাতের নোয়া সকলের সামনে খুলে ফেললে তবেই স্বাধীনভাবে অন্যজনকে বিয়ে করতে পাবে।[১]

পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে আর বিবাহের কোন আচার পালিত হয় না। বিবাহেচ্ছু মহিলার অভিভাবক কিছু কন্যাপণ গ্রহণ করে থাকে মাত্র। অবশ্য অনেক সময় এই পণের দাবি আনুষ্ঠানিক মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না, বা টাকা দেওয়ার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় না। এই বিষয়ের দু-একটি উদাহরণ এই রকম: নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত হরিখালি গ্রামের সুধীর বিবাহ বিচ্ছেদকারিণী সুভদ্রাকে এবং খেজুরী থানার মুণ্ডামারী গ্রামের কার্তিক সারদা নাম্নী বিবাহবিচ্ছেদকারিণীকে বিবাহ করেছে।

আচার-অনুষ্ঠান—জীবন-প্রবাহ :

কাকমারাদের জীবন-প্রবাহে আচার-অনুষ্ঠান খুবই সামান্য; যেমন, শিশুর জন্ম, যৌবন-প্রাপ্তি, বিবাহ ও মৃত্যু-সংস্কার। কোন মেয়ে সন্তান-সম্ভবা হলে তাদের খাওযা-দাওয়া ও চলা-ফেরা সম্পর্কে সামান্য কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। সন্তান প্রসবের পর পরিবারের কোন বর্ষীয়সী মহিলা বা অভাবে সদ্য সন্তান প্রসবকারী মা নিজেই শামুকের খোলা দিয়ে শিশুর নাড়ি ছেদন করে। কিছু দিন আগে [গত বছর—১৯৫৭] ভিক্ষার কাজে ঘুরে বেড়াবার সময় একটি দোকানের মধ্যে শ্রীনিবাসের বৌ শৈলবালা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দেয় এবং সে নিজেই ঐ শিশুর নাড়ি কাটে। পরে তার ফুল গ্রামের বাইরে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দেয়। এক কলসি জল দিয়ে নব জাতককে ধোওয়া হয় এবং তিন দিন ঐ শিশুকে শুধু মধু খাইয়ে রাখা হয়। এর পর প্রসূতি শুধু নিজের হাত-পা ধুয়ে নেয় এবং তিন দিনের দিন ভালভাবে স্নান করে। তিন দিন ঐ প্রসূতিকে আলুভাজা, কলা এবং তরল খাদ্য দেওয়া হয়।

একুশ দিনের দিন আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সাধ্য-মতো কিছু ভালো খাবার দিয়ে আপ্যায়নের মাধ্যমে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান করা হয়। নামকরণ বা অন্নপ্রাশনের কোন অনুষ্ঠান হয় না।

---

১. কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতের নোয়া খুলে দিলে তবেই তাকে বিধবা হিসাবে গণ্য করা হয়।

যৌনতা প্রাপ্তির আচার :

মেয়েদের প্রথম ঋতু আরম্ভের অনুষ্ঠান বেশ মনোযোগের সঙ্গে পালন করা হয় এবং প্রথম ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাদের মাকে জানায়। তখন তার জন্য বাড়ি থেকে একটু দূরে পৃথকভাবে খেজুর বা তালপাতা দিয়ে পশ্চিম খোলা একটা ছোট্ট কুঁড়ে তৈরি করে দেওয়া হয়। সেখানে তাকে তিনদিন থাকতে হয়—প্রত্যেকদিন বিকেলে তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয় এবং খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় চালের তৈরি মিষ্টি লপ্‌সি। চারদিনের দিন অবগাহন স্নান করে সে বাড়ি ফিরে আসে। নির্জন পাতার কুঁড়েতে ঋতুমতী সদ্যযুবতী যদি একা থাকতে ভয় পায়, তবে সে সমবয়স্কা একজনকে সঙ্গী হিসাবে নিতে পারে।

বিবাহ-সংক্রান্ত আচার :

ঋতুমতী হওয়ার পরেই সাধারণত মেয়েদের বিয়ে হয়। আন্তর-আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হলেও উভয় পক্ষের বয়স্কদের মধ্যে আগে বিয়ের আলোচনা করা হয়। বরযাত্রীসহ বর নির্দিষ্ট দিনে কনেকে বিয়ে করতে আসে। বয়স্করাই বিয়ের দিন ঠিক করে। ভাদ্র এবং চৈত্র মাস এদের কাছে বিয়ের পক্ষে অশুভ মাস। বর নতুন ঝুড়ি করে কনের কাপড়-চোপড়, একটি কাঠের জপ-মালা, একটি লোহার বালা, সিঁদুর, পান-সুপারি এবং অল্প-পরিমাণে কিছু চাল নিয়ে আসে। সঙ্গে আরো আনে একটি তালপাতার চেটাই। বরযাত্রীরা ঐটিকে আসন হিসাবে ব্যবহার করে। এরপর একটি থালায় কিছু চাল, ন-টি পান, ন-টি সুপারি চারটি নগদ টাকা রেখে পাত্রের বাবা বা অভিভাবক পাত্রীর বাবাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। ঐগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার পর কনের বাবা তিনবার ঐগুলি বরকে ফেরৎ দিয়ে অবশেষে একেবারে নিয়ে নেয়। এর পরের অনুষ্ঠান হলো, কনের বাবা বরের অভিভাবক ও সমাগত আত্মীয়দের অনুমতি নিয়ে বর-কনেকে স্নান করাতে নিয়ে যায় ও স্নানের পর নতুন কাপড় পরিয়ে বিবাহস্থানে ফিরিয়ে আনে। কনের বাবাকে 'বাউর্দি' নামে একজন 'প্রধান বিবাহ পরিচালক' ঐ-সব কাজে সাহায্য করে থাকে। সে বর-কনের কাপড়ের আঁচলে গিঁট বেঁধে দেওয়ার পর বর-কনেকে উপস্থিত সকলকে নমস্কার জানাতে এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বলে ; প্রধান বিবাহ পরিচালক উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এমন মত দেওয়ার এবং এই বিয়ের সাক্ষী থাকার কথা বলে।

এবং পরে বিবাহকার্যে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য দম্পতিকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে কনের ভাই চিৎকার করে দম্পতিকে বলে যে, 'তোমাদেব যদি কোন মেয়ে হয় আমাকে দেবে তো?' দম্পতি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, দেবো।' এরপব বর-কনেকে দুটি পৃথক পাত্রে খেতে দেওয়ার পরই বিবাহনুষ্ঠান শেষ হয়।

এদের মধ্যে একটা সাধারণ রীতি আছে যে, দুটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত বরকে ঘর-জামাই হয়ে থাকতে হয়। অন্যথায় শ্বশুবকে আরও চারটি টাকা দিতে হয়।

মৃত্যু-সংস্কার :

কাকমারাদের মৃত্যু হলে মৃতের মাথাটিকে উত্তব-মুখো করে কবর দিতে হয় এবং এই কাজে সাহায্যের জন্য আত্মীয়-বান্ধবদেব সংবাদ দিতে হয়। মৃতদেহকে কবর দেওয়াই এদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কবর দেওয়ার আগে মৃতদেহটিকে ভালো করে ধুয়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে নেওয়া হয়। তিন দিন ও তিন রাত্রি ঐ কবরটিকে পাহারা দেওয়া হয় এবং চতুর্থ দিন বুক-সমান উঁচু একটি মাটির স্তূপ ঐ কবরের ওপর তৈরি করে দেওয়া হয়। এরা দশদিন ধরে অশৌচ পালন করে এবং এগার দিনের মাথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এই অনুষ্ঠান করানোর জন্য তারা তাদের একজন আত্মীয়কে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনার জন্য ডেকে আনে। সে এসে প্রথমে প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারীসহ পরিবারের সমস্ত সদস্যের ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করে—এর জন্য সে কিছু পারিশ্রমিকও পায়। মৃত ব্যক্তি যেখানে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলো সেখানটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনটি কলাপাতা বিছিয়ে তার কাছে ঐ মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী যেমন, মাথার পাগড়ি, লোহার বালা, গলার মালা, ছুরি ইত্যাদি জড় করে রাখে এবং ঐ তিনটি পাতার মধ্যে দুটির ওপর বাজার থেকে কিনে আনা ফলমূল, তরিতরকারি বিছিয়ে দেয়। আর তৃতীয় পাতাটির ওপর কিছু ভাত ও গুড় রাখে। এরপর একটি শুয়োরের বুকে সাতবার লাঠি দিয়ে ঘা মেরে, মেরে ফেলে চারজন জোয়ান তার শরীর থেকে চারটে পা ছিঁড়ে নেয়। একটা মুরগী বলি দিয়ে সেটিকে আলাদাভাবে রাখা হয়। মাটিতে আছড়ে মেরে একটি কুমড়োকে ফাটিয়ে সেটিকে রান্না করা হয়।

আগেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে যে চাল ও গুড় তাকে রান্না করার জন্য একটিমাত্র গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হয়। ঐ সমস্ত উপকবণই মৃতের আত্মাকে উৎসর্গ করা হয়। এরই মধ্যে ভাতের তিনটি নাড়ু করে একটি কবরের ওপর রেখে দিয়ে আসতে হয়। এইভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আত্মীয়-পরিজনেরা ভোজে যোগদান করে।

গোষ্ঠী সংগঠন :

নিজেদেব সমস্যা সমাধান করাব জন্য এদের কোন সম্প্রদাযগত পঞ্চায়েত নেই। যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় বা কাবোব বউ পালিযে যায়, তখন এদের সমাজের বয়স্কেরা একত্র হয়ে অপরাধীর বিচাব করে। একবার মোকরামচকের যতীন দাসেব বউ অন্য একজনেব সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। যতীন তার পরিবার এবং সমাজের কাছে নালিশ জানায় এবং তার বউ খুঁজে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি ভাড়াও দেয়। শেষে কাকদ্বীপ বাজারের কাছে অপরাধী দু-জনকে পাকড়াও করে বেশ ঘা-কতক দিয়ে যতীনকে তার বউ ফেরৎ দেওয়া হয়। এতেও কিন্তু যতীনের রাগ পড়ে না। সে হুঁকো পুড়িয়ে তার বউ-এর চিবুকে, দাগা দিয়ে দেয়। এরপর অবশ্য তাবা সুখেই বাস করেছে। এই বকম আরো অনেক ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ধর্ম এবং উৎসব :

এরা নিজেদের হিন্দু হিসাবে পবিচয় দেয় এবং প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কালী, শীতলা ও মনসার পুজো করে। নিজেদের সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ লোকেরাই পুরোহিত, ধোপা, নাপিতের আনুষ্ঠানিক কাজগুলি করে থাকে। অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোকেরা যে পৌরোহিত্যের কাজ করে তাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো অত সব মন্ত্র-তন্ত্র নেই—সে-সব থাকার কথাও নয়। এবা কখনো-কখনো পাঁঠা বলি দিয়ে থাকে। ঠাকুর-দেবতাদের আকার বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থায়ী মানসিকতা বা বিচারবোধ গড়ে ওঠেনি। তাই আবছা বা ঘোলাটে ধারণা তাদের মন ও মানসিকতাকে সাময়িকভাবে ঘিরে রাখে। অবশ্য এরা কোন কোন দেবতার প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পোষণ করে থাকে। তাই তাদের প্রীতি পাবার জন্যই উক্ত বলির ব্যবস্থা। সমস্তরকম রোগ দূরীকরণ বা আপেক্ষিক শান্তির জন্য তারা ঐ সব ভীষণ দেবদেবীর পুজো করে।

ঐ পুজোপলক্ষে এরা ভাত পচিয়ে তাড়ি করে এবং পুজোর প্রসাদ হিসাবে তা খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে।

উপসংহার :

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কাকমারারা একটি 'ক্ষুদ্র গোষ্ঠী'। বহুধাবিভক্ত বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর পাশে ভ্রাম্যমান অবস্থায় এদের অবস্থান। যাযাবর এবং কিছুটা বস্তুকেন্দ্রিক অশুচি জীবন-যাপন — পারিপার্শ্বিক, বলিষ্ঠ, স্থায়ী ও বৃহত্তর সমাজজীবন-প্রবাহের সঙ্গে এদের মিশতে দেয়নি। এমনকি ঐ একই কারণে প্রতিবেশী বৃহৎ সমাজের পাশাপাশিও থাকতে পারেনি। কুশ্রী জীবন-প্রথা, শুচি ও অশুচির পরিধির বাইরে এক কুহেলিময় পরিবেশের মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করে এরা এখনও যাযাবরই থেকে গেছে।

এই কাকমারা সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র বলে নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। মনে হয় ঐ যাযাবরত্বই তাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে পরিণত করেছে। এই ভ্রাম্যমানগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতাহীনতার ফলে এক স্বল্প-পরিসর দুর্বল জীবনকে বাঁচার পথ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে তাদের পাশে যে বৃহত্তর, বলিষ্ঠ ও প্রাচীন সমাজ রয়ে গেছে তার পরিপূরক কোনো বৃত্তিও তাদের যাযাবরত্ব ঘুচিয়ে স্থায়ী হতে পথ দেখাচ্ছে না। যদিও শেষোক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সংশ্লেষ ঘটে, কিন্তু তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। পাশাপাশি এও লক্ষণীয় যে, এদের মধ্যে এমন কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান নেই যা বৃহত্তর ও বলিষ্ঠ কোনো গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে পারে। অধিকন্তু কাকমারাদের ভাবভঙ্গী-ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মানসিকতা তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। হয়তো এখানেই তাদের শক্তি — যা এই যাযাবরদের স্ব-সৃষ্ট পথে আজও প্রবহমান।

ভাষান্তর : সনৎকুমার মিত্র



□ লেখক পরিচিতি □

□ ***উইলিয়াম ক্রুক :*** ইংরেজ, সিভিল সার্ভিসের সূত্রে ভারতে এসে এদেশের সংস্কৃতিকে ভালোবেসে ফেলেন। তারই ফল হল দুই খণ্ডে *The Popular Religion and Folk-Lore of Northern India [1893]* নামক অনন্য গ্রন্থ। ইনি ছিলেন Bengal Civil Survice-এর লোক।

□ ***ক্ষেত্র গুপ্ত :*** 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদে'র সভাপতি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক [অবসরপ্রাপ্ত]। একালের একজন অগ্রণী প্রাবন্ধিক। সত্তরের বেশি মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। মধুসূদনের ওপর অনন্য গবেষণার জন্য বাঙলাদেশ থেকে মধুসূদন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যাসাগর পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

□ ***ড. ধীলন রায় :*** আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের [নব ব্যারাকপুর] প্রাণী বিদ্যাবিভাগের প্রধান। *Studies on the Gut Infusioris and Indian Anurans* বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. প্রাপ্তি [১৯৮৮]। নিজস্ব বিদ্যা শৃঙ্খলায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন — যা দেশি-বিদেশি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত।

□ ***নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব*** [১৮৬৬—১৯৩৮] দীর্ঘ সাতাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ২২ খণ্ডে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ করেন [১৯১১]। বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে তথা সার্বিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই মহাগ্রন্থ বেদস্বরূপ। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে কাক-বিষয়ক আলোচনাটি কিছু সম্পাদিত করে এখানে নেওয়া হয়েছে।

□ ***ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক :*** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান [বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত]। অগ্রণী লোকসংস্কৃতিবিদ এবং অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা — তার মধ্যে 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা', 'বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা', 'প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত', 'বিহঙ্গচারণা' প্রভৃতি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁর তথ্যভূয়িষ্ট মনের পরিচয় বহন করছে। লোকসংস্কৃতি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে এঁর স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ যে কোন লেখনিজীবীর ঈর্ষা উদ্রেক করবে।

□ ***ড. প্রবোধকুমার ভৌমিক :*** আধুনিক ভারতে ড. ভৌমিকের নাম নৃবিজ্ঞান চর্চায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ইংরাজি ও বাঙলায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণেতা। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে লোধাগ্রাম 'বিদিশা' তৈরি করে ইনি নৃবিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ করেছেন। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁর অনুরাগ, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার ব্রত-রূপ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

□ ***ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী :*** একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্। 'বাঙলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', 'বাঙলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র', 'প্রগল্প', 'টডের রাজস্থান ও বাঙলা সাহিত্য' ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্তমানে 'কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি' বিভাগের প্রধান।

□ ***ড. বিজনকুমার মণ্ডল :*** লোকসংস্কৃতির একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সম্প্রতি 'সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক এবং 'গুরুসদয় সংগ্রহ শালা'য় কর্মরত।

□ ***ড. মানস মজুমদার :*** কৃতী ছাত্র। 'বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের রীডার। লোকসংস্কৃতি এঁর বিশেষ পাঠ্যবিষয়। নানা প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় ইনি প্রবন্ধ লিখে থাকেন। 'নাট্যকার ভবশঙ্কর', 'লোক-ঐতিহ্যের দর্পণে,' রাম-রামায়ণে-রবীন্দ্রনাথ', পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ও বাঙলা ছোটগল্প' এঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

□ ***মুহম্মদ আবদুল জলিল :*** বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ। কিছুকাল ঢাকার বাঙলা আকাদেমীর লোকসংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা।

□ ***অধ্যাপক শুভঙ্কর ঘোষ :*** কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে বাঙলা বিভাগের রীডার। কবি ও প্রাবন্ধিক। ১৯৯৬ সালে 'উত্তরবঙ্গ নাট্যসমাজ ও গুণীজন সংবর্ধনা কমিটি' কর্তৃক কবি ও প্রাবন্ধিক হিসাবে সংবর্ধিত হন। পেশার বাইরে তিন দশক ধরে কবিতা-প্রবন্ধ লিখে অসংখ্য লিটিল ম্যাগাজিনকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। 'মোহনায় হেঁটে যাচ্ছি [১৯৮৮], 'আত্মসমর্পণহীন জীবনের গান' [১৯৯৪]। 'ঋণী থেকে গেছি' [১৯৯৫] কাব্য গ্রন্থগুলি এবং

'উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কলকাতা' [১৯৯৫] প্রবন্ধ গ্রন্থ অধ্যাপক ঘোষের সাহিত্যিক প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

☐ **ড. *সত্যবতী গিরি*:** বাঙলা সাহিত্যের একজন কৃতী ছাত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার। অসংখ্য চিন্তা ঋদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করে বিদগ্ধ-সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। 'বাঙলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ'—একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সম্প্রতি ইনি 'বনফুল স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন। এঁর সারস্বত-সাধনা দেশ-বিদেশে সম্বর্ধিত।

☐ **ড. *সনৎকুমার মিত্র*:** বাঙলা সাহিত্যের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি বই আছে।

☐ **ড. *স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়*:** কৃতী ছাত্রী। কলকাতার শ্রীশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার। বুদ্ধদেব বসুর ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মোক্ষদা সুন্দরী স্বর্ণপদক' পেয়েছেন এবং ঐ একই লেখকের ওপর গবেষণা করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. হয়েছেন। বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধের রচয়িতা।

